ধাঁধাপুরীর
গোলকধাঁধা
সুজন দাশগুপ্ত

স্বপ্নপুরী, মায়াপুরী, ভোজপুরী, ডাল-পুরি, শুধু পুরি—এমন-কি ভেলপুরী পর্যন্ত আমাদের অচেনা নয়, কিন্তু ধাঁধাপুরী? সে কোন্ মুল্লুকে? তার কথা কি আগে শুনেছি?

একে তো ধাঁধা ব্যাপারটাই বেশ প্যাঁচালো—আর, জিলিপির মতোই, যত প্যাঁচালো ততই রসালো—তার উপর যদি হয় গোলকধাঁধা, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। পালাবার পথ খুঁজে না পেয়ে কেবলই ঘুরপাক খাওয়া, আর রসের পাকে জড়িয়ে যাওয়া।

ঘুরপাক যে একটু খেতেই হবে তাতে ভুল নেই, তবে ভরসার কথা, পালাবার পথও এই বইতেই বাতলে দিয়েছেন সুজন দাশগুপ্ত, 'ধাঁধাপুরীর গোলক-ধাঁধা'য় যাঁর কল্যাণে অবারিত আমন্ত্রণ। মজার ব্যাপার হল, রসের পাকের হেরফের হয়নি এই পথ-বাতলানোয়। বরং একটু ঘনই হয়েছে বলা যায়। আসলে ধাঁধা তো শুধুই জট-পাকানোর খেলা নয়, জট খোলার আনন্দও কম নেই সেখানে। 'ধাঁধাপুরীর গোলকধাঁধা'য় বিস্তর মজাদার জটিল ধাঁধা যেমন দিয়েছেন সুজন দাশগুপ্ত, সেইসঙ্গে দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে সেই জট খুলতে হয়।

১০.০০
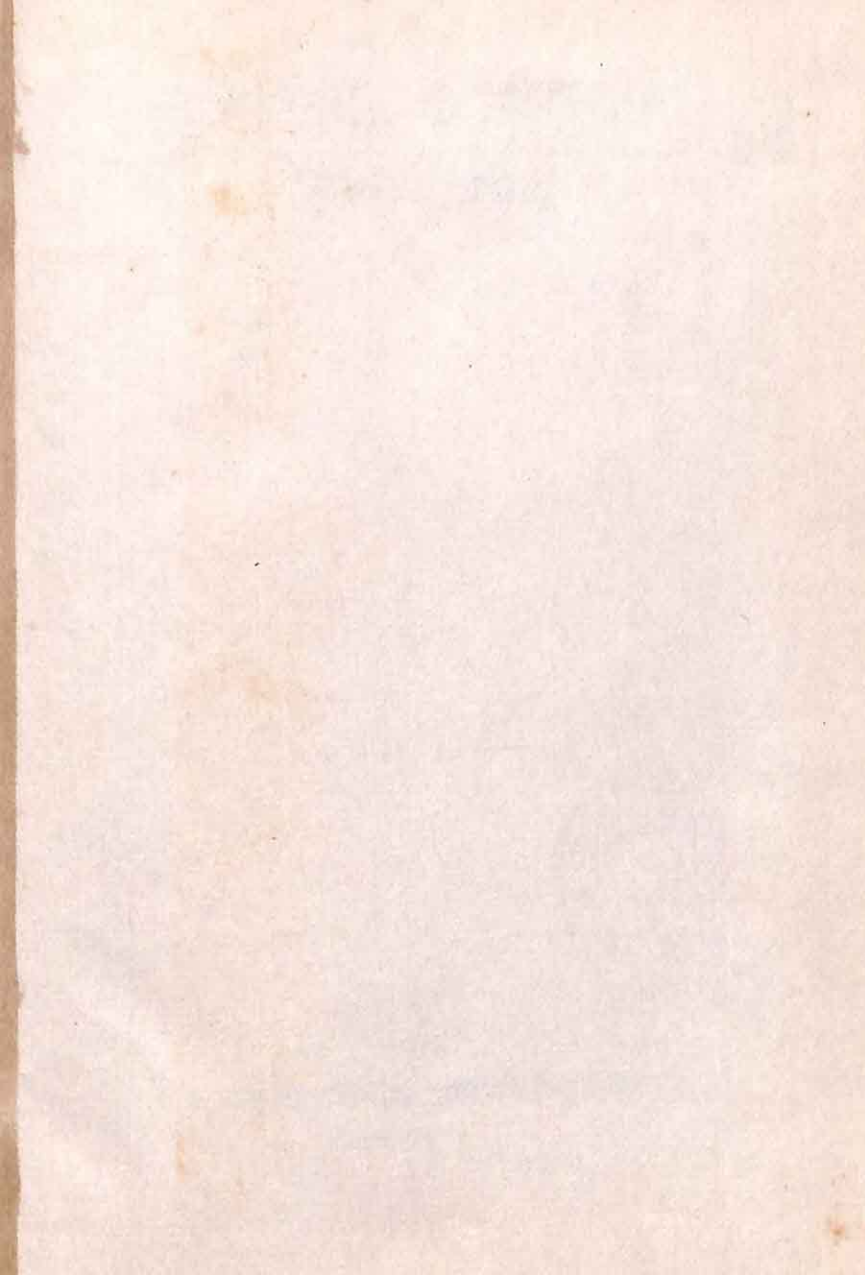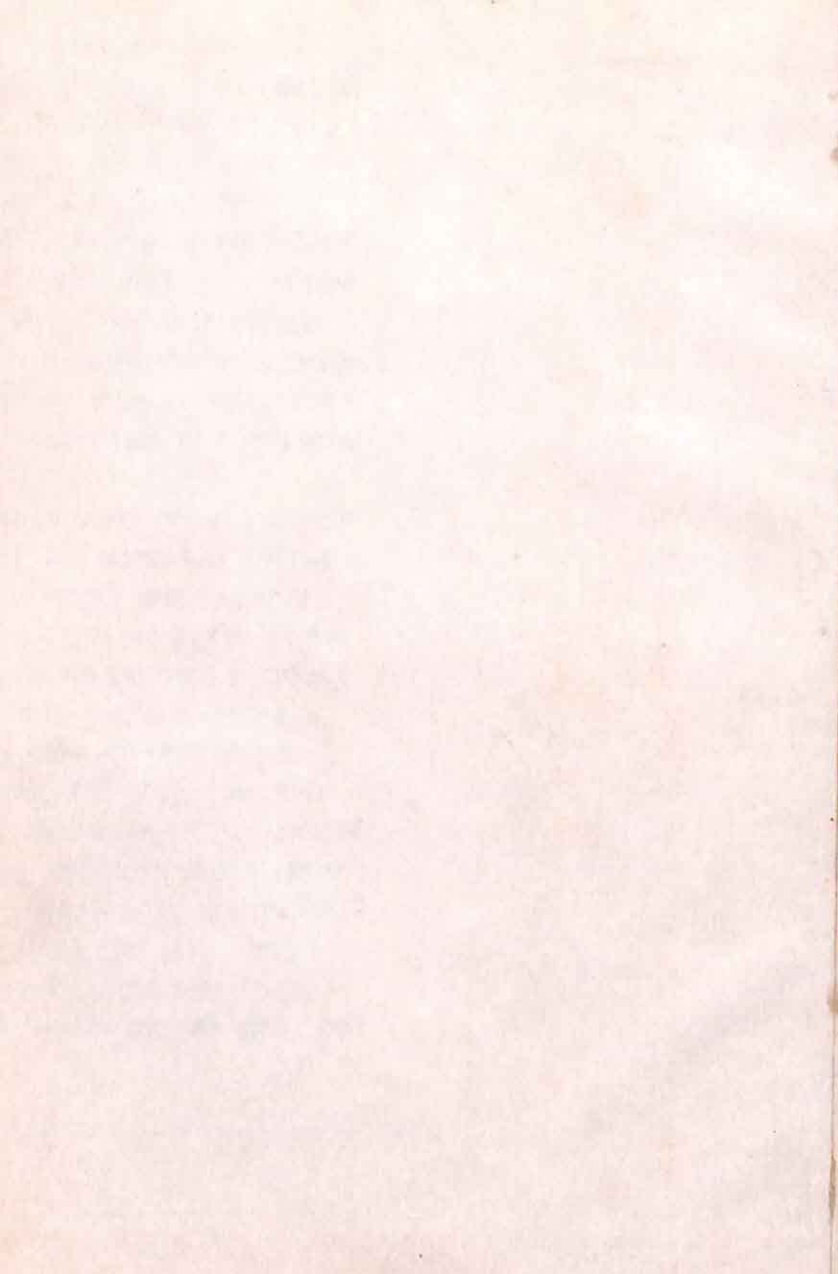
ধাঁধাপুরীর গোলকধাঁধা

সুজন দাশগুপ্ত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৮৬

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম
কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ১০·০০

ধাঁধাপুরীর গোলকধাঁধা
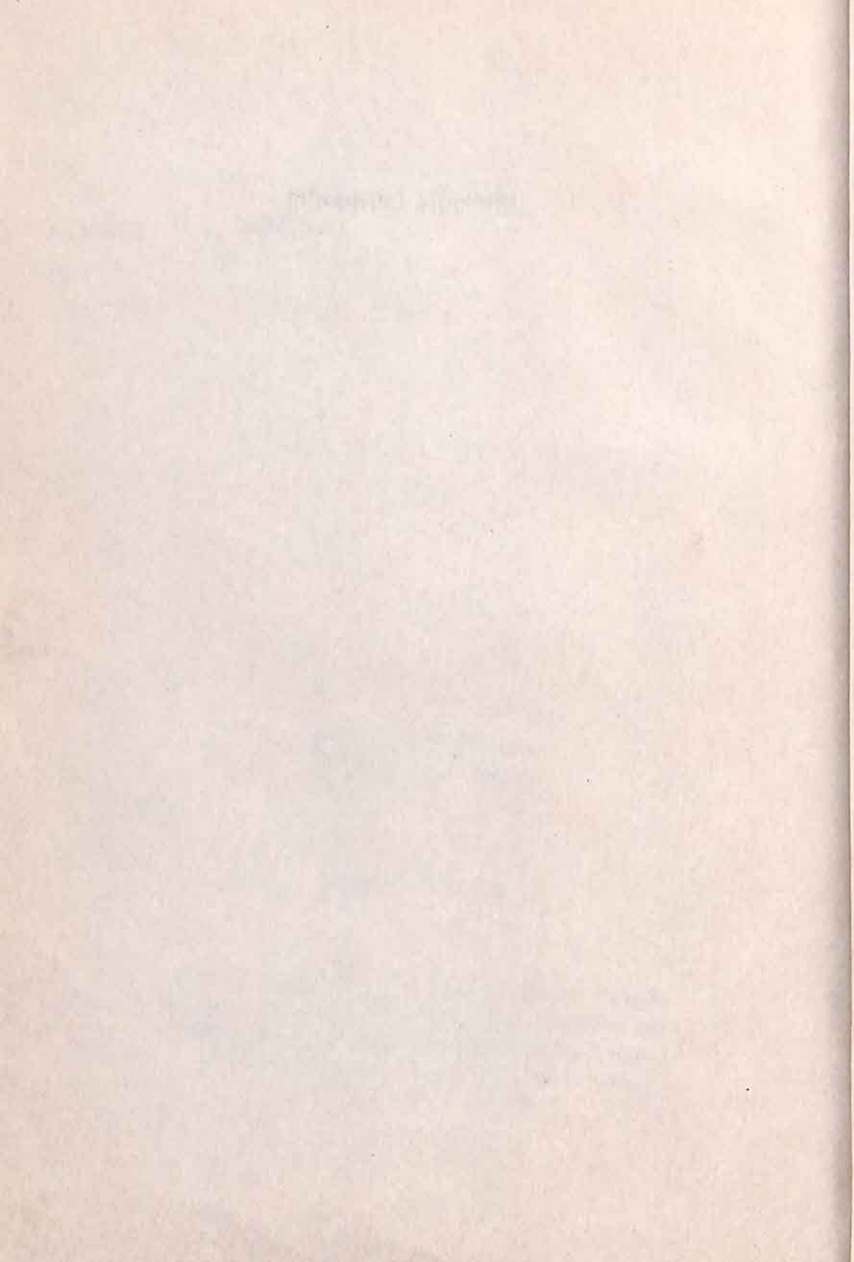
॥ এক ॥

ছোড়দা কলেজ থেকে ফেরার পর কাগজটা ওকে দেখালাম। মায়ের বকুনি খেয়ে দুপুরবেলায় চিলকোঠার পুঁচকে ঘরটা পরিষ্কার করার সময় একটা পুরনো ট্রাঙ্কের তলায় কাগজটা আবিষ্কার করেছিলাম। আর কাউকে দেখাইনি। আর কেউ দেখলে এ নিয়ে ঠিক হাসাহাসি করত। বিশেষকরে আমার ছোটবোন বিন্দি। ওর ধারণা আমি সব কিছুতেই খামোকা রহস্য খুঁজি। এ জিনিস একমাত্র ছোড়দাকেই দেখান যায়। ওযে শুধু বুঝদার তাই নয়, মাথাটাও ওর খুব পরিষ্কার। নইলে কি আর এমনি এমনি হায়ার সেকেন্ডারীতে সেভেন্টি ফোর পার্সেন্ট পায়? জানতাম ছোড়দা কাগজটাকে আজেবাজে ভাববে না। ওতে যে একটা গুপ্তধনের খবর লেখা আছে সে বিষয় আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কাগজটা বহুদিনের পুরনো, হলদে হলদে হয়ে গেছে। লেখাগুলোও অস্পষ্ট, তার ওপর পুরনো কেলে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে টেনে টেনে লেখা। বোধহয় কেউ খুব তাড়াহুঁড়ো করে লিখেছিল। পুরো লেখাটা উদ্ধার করা কঠিন। বিশেষত যেখানে যেখানে ভাঁজ পড়েছে, সে সব জায়গার অক্ষরগুলোতো পড়াই যায় না। আন্দাজ করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই নেই। অনেক কষ্টটষ্ট করে মনে হল সবটাই পড়ে উঠেছি :

ধাঁধাপুরীর গুপ্তধন

রাজপুরী আবিষ্কার করিতে পারিলে গুপ্তধন বিষয়ক যাবতীয় নির্দেশ

মিলিবে। দম্‌দম্‌ করিয়া রাজপুরী যাইবার **চাবি নিচের** পঙক্তিগুলিতে দেওয়া হইল।

বলেন ধাঁধাপুরীর রাজায় :
"শ্যাওলাধরা ইঁটের পাঁজায়
রয়েছে এক মজার সিঁড়ি
নাই কোনো ছাঁদ নাই কো ছিরি—
বৃথাই সেথায় সিঁড়ি ভাঙ্গা,
না যায় ওঠা না যায় নামা ;
তেমন সিঁড়ি দেখলে পরে
মধ্যিখানের গর্ত ধরে
নামলে পরেই মিলবে দেখা
সুড়ঙ্গ এক তেরা ব্যাঁকা—

শোনরে সবাই ওরে ছাগল
ভাবিস না যে আমি পাগল !
জেনে রাখিস কালোই ভাল,
কালোই জগত করছে আলো ;
এই বিশ্বাস মাথায় রেখে
চোখবরাবর চলবি দেখে,
চক্ষু হলেই ছানাবড়া,
হেঁইও বলে পাথর নাড়া ॥"

কবিতার নিচে কতগুলো লাইন টানা। অনেকগুলো লাইনের শেষে আবার জিজ্ঞাসা চিহ্ন দেওয়া আছে
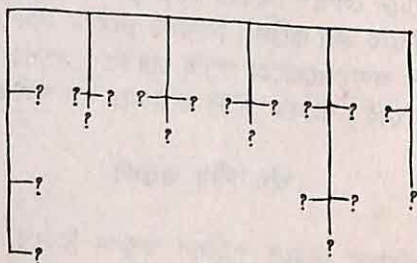
জানতাম ট্রাঙ্কটা ছিল দাদুর। কাগজটা যখন সেটার নিচ থেকে বেরিয়েছে, তখন লেখাটা হয়ত দাদুর হবে। মা'র কাছে দাদুর লেখা পুরোনো একটা চিঠি দেখেছিলাম, সেখানেও লেখার ধরনটা ছিল এরকমই। টানাটানা বিচ্ছিরি। কিন্তু দাদুকেতো আর পাওয়া যাবে না! তিনি মরে গেছেন বহুদিন। আমার বয়স তখন ছিল মাত্র সাড়ে তিন। দাদু ছাড়া আর কে জানতে পারে? ছোটমামা হয়তো পারে। আগে এসব ব্যাপারে ওঁর বেশ উৎসাহই ছিল। আমার সাথে তখন কত রকমের স্পাই অ্যাডভেঞ্চারের খেলা খেলতেন, ইংরেজী থ্রিলারের গল্প বলতেন। কিন্তু বিয়ের পরে কেমন জানি ড্যাপসা মেরে গেছেন। আজকাল শুধু মামিমা আর বড়দের সঙ্গে গ্যাঁট হয়ে বসে গাদাগাদা আনইন্টারেস্টিং কথা বলেন। জিজ্ঞাসা করতে গেলে 'পড়াশুনো করছিস না কেন বলে হয়তো এক বিরাট ধমক লাগাবেন! মা আর বাবাতো আউট অফ দ্য কোয়েশ্চেন। কি আর করা, নিজেই বেশ কয়েকবর লেখাটা পড়লাম। বিশেষ কিছু বোধগম্য হল না। তবে ম্যাপটা দেখতে দেখতে মনে হল, কেউ বোধহয় একটা সুড়ঙ্গের ছবি আঁকার চেষ্টা করেছে। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, ম্যাপটা বেশীদূর এগোয়নি। ওই যাঃ, একটা কথা বলতে তো ভুলেই গেছি! আমাদের বাড়ির ঠিক পিছন দিকেই, মাত্র একশ গজের মত দূরে রয়েছে একটা বিরাট ইঁটের পাঁজা। বহুবছর ধরে জলেবৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সেটাতে শ্যাওলা পড়েছে এই পুরু। প্রশ্ন হল, এটাই কি সেই ইঁটের পাঁজা? এরফাঁকেই কি কোথাও লুকিয়ে আছে গুপ্তধনের পথ? কিন্তু কিভাবে তার হদিশ মিলবে? কিভাবে, কি ভাবে?

ছোড়দা বাড়ি ফিরতেই, ওকে পাকড়াও করে সোজা ইঁটের পাঁজার কাছে নিয়ে গেলাম। ছোড়দাকে কাগজটা হাতে ধরিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। ও পড়ছে, আর আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে। খালি ভাবছি ও যেন এটাকে নস্যাৎ না করে দেয়। ছোড়দা দেখি মন দিয়ে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল। তারপর বলল, "হয় এটা একটা বিরাট জোক, অথবা তুই যা ভাবছিস, ঠিক তাই। কিন্তু একটা জিনিস আমার পাজ্‌লিং লাগছে। লেখাটা পুরনো দিনের, অথচ কবিতাটা একেবারে আধুনিক কথ্যভাষায়। খুব আনইউস্যুয়াল!"

ছোড়দা যে গুপ্তধনের সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়নি, তাতে আমার ভীষণ ভালো লাগলো। উৎসাহের সঙ্গে বললাম, "একদিক থেকে বাঁচোয়া, কথাগুলো অন্ততঃ খটমট নয়।"

"তা নয় ঠিকই। কিন্তু ক্লু-গুলোর মাথামুন্ডু আমি তো কিছু বুঝছি না। ইঁটের পাঁজা কথাটুকুই শুধু পরিষ্কার। তুই আর কিছু বার করতে পেরেছিস ?"

আমারও মাথায় কিছু ঢুকছিল না। ভেবেছিলাম ছোড়দা একদানে ধরে ফেলবে। তা যখন হল না, তখন প্যাঁচটা বেশ জোরালোই। তার উপর লেখাটা হচ্ছে পদ্যে। পদ্যের ধাঁধা দেখলে এমনিতেই আমার আরও গুলিয়ে যায়। বললাম, "পদ্য করে বলেছে, তাই হয়েছে আরও মুশকিল।"

ছোড়দাও একমত হল, "আগেকার লোকগুলো আবার পদ্য ছাড়া ধাঁধা লিখতে পারতো না। আর ছন্দ মেলাতে গিয়ে ক্লু-গুলোকে মার্ডার কোরতো।"

"তবু শ্যাওলাধরা ইঁটের পাঁজাটা তো পরিষ্কারই বোঝা গেছে।"

"তা ঠিক। সেদিক থেকে জায়গাটা এটা হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এরকম অজস্র ইঁটের পাঁজা বহু জায়গাতেই আছে।"

ছোড়দার শেষ কথাটা আমাকে একটু দমিয়ে দিল। কথাট ভুল না। তবে আমি খুব প্রার্থনা করছিলাম, যেন এই জায়গাটাই সেটা হয়। কিন্তু তাকি কখনো হবে!

ছোড়দা আমার দিকে একটুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে বলল, "ভাবিস না, একটা সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি। লিখেছে, 'দমদম করিয়া রাজপুরীতে যাইবার চাবি'। 'দমদম করিয়া' কথাটামনে হচ্ছে এখানে জোরকরে ঢোকান হয়েছে। যেন ক্লু দেওয়া হচ্ছে যে জায়গাটা দমদম।"

"তার মানে তো এখানে ?" আমার প্রার্থনার ফল হাতে হাতে পাচ্ছি মনে হল।

"আচ্ছা ধরে নে এটাই সেই পাঁজা। কিন্তু তার পরের কথাগুলোর অর্থ কি ? বলেছে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা কোনওটাই করা যায় না। সেটা কি করে সম্ভব ? সিঁড়ি মানেতো ওঠা-নামা দুটোই চলবে।"

আমারও ওখানটায় গোলমাল লাগছিল। তাই কোনও উত্তর দিলাম না।

"এক হতে পারে..." ছোড়দা কি একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ কিছু দেখে একদম চুপ করে গেল। তাকিয়ে দেখি একজন মোটাসোটা গোলগাল লোক ঘাম মুছতে মুছতে ইঁটের পাঁজার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছেন। ভদ্রলোকের মাথাজুড়ে বিশাল টাক। টাকের আশেপাশে যে কটা চুল আছে,

সবগুলোই ঘামে ভিজে চ্যাপ্টা হয়ে মাথার সঙ্গে লেপ্টে আছে। গায়ের ফিনফিনে পাঞ্জাবীও শরীরের সঙ্গে চ্যাপ্টানো। পাঞ্জাবীর হাতায় শ্যাওলার সবুজ সবুজ ছোপ, সারা গা ধুলোবালিতে ভর্তি। ভদ্রলোককে কোথায় জানি আগে দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না !

"গুপ্তধনের খোঁজে বুঝি ?" আমাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন টাকমাথা।

আমি বোকার মত বলতে যাচ্ছিলাম, 'হ্যাঁ।' ছোড়দা সেটা বুঝতে পেরে, হাতের কব্জিতে চাপ দিয়ে নিচু গলায় বলল, "একদম চুপ।" তারপর ভদ্রলোকের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করল, "আপনি ?"

ভদ্রলোক প্রশ্নটা কানেই তুললেন না, "বুঝেছি, বুঝেছি, আর কেউ শুনে ফেলুক সেটা চাও না, তাই না ?" সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চস্বরে স্বগতোক্তি, "ভারি তালেবর ছেলে তো !" তারপর দেখি গলার স্বর তিনধাপ নিচু করে মাইডিয়ার ভঙ্গিতে ছোড়দাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "বলোই না, গুপ্তধনের খোঁজে বুঝি ?"

ছোড়দা এবার চটে উঠল, "আপনি কে মশাই, কোত্থেকে আসছেন ?"

ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে বললেন, "আমি গুণেন দত্ত। থাকি বইগাছি, আসছি হাবড়া থেকে।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "সে কি করে হয় ?"

এতক্ষণে ভদ্রলোক আমাকে লক্ষ্য করলেন। চোখ কুঁচকে বলনে, "খুবই সহজ। আমার বাড়ি বটগাছি, কিন্তু ট্রেন ধরি হাবড়া স্টেশন থেকে। বুঝেছো ?"

আমার একটু রাগ হল। ভদ্রলোক বললেন একটা অযৌক্তিক কথা, অথচ ভাব দেখালেন যেন এই সহজ জিনিসটাও আমি বুঝছি না ! এ বিষয় কোনও তর্ক তোলার আগেই ছোড়দা কড়া প্রশ্ন করল, "তা এখানে কি করছিলেন ?"

"এটা আবার প্রশ্ন হল নাকি ! গুপ্তধনের খোঁজ করছিলাম ! নইলে এই আদ্যিকালের পচা ইঁটের পাঁজায় গর্ত হাতড়াতে বয়েই গেছে আমার !"

"পেলেন নাকি ?" গুপ্ত ধনের নাম শুনে আমি তো উত্তেজিত !

"ক্ষেপেছো, ব্যাটা ভারি ধড়িবাজ, সুড়ঙ্গ ফুরঙ্গর চিহ্নই নেই।"

" কার কথা বলছেন আপনি ?"

"মানে ? তোমরা তাহলে কিছুই জানো না ?" ভদ্রলোক অবাক হয়ে

ছোড়দার দিকে তাকালেন।

পাছে ভদ্রলোক চুপ করে যান, তাই তাড়াহুড়ো করে বললাম, "না না, কিছু কিছু জানি।"

"তাও শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে। আপনি প্রবীণ লোক, নিশ্চয় এ ব্যাপারে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞ।" ছোড়দা এবার ভদ্রলোককে একটু তেল দিল।

"তা বটে,তা বটে," ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বেশ সন্তুষ্ট হলেন। "শ্রদ্ধাভক্তি আজকাল বিরল, বড্ড অভাব ওগুলোর এ দেশে। তোমরা অবশ্য..." ভদ্রলোকের গলা ধরে এল, কোঁচার খুঁটে চোখ মুছলেন দুবার। এই সেরেছে, ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবেন নাকি ? নাঃ, সামলে উঠলেন দিব্যি। গলাটা ঝেড়ে বললেন, "তোমাদের দেখাতে আর বাধা কি ! দাঁড়াও দেখি।" এ পকেট ও পকেট, অনেক খোঁজাখুঁজি করে শেষমেষ কোমরে জড়ান একটা থলির ভিতর থেকে এক চিলতে কাগজ বের করলেন গুণেন দত্ত। তরপর হঠাৎ পাঁজার উপর লাফিয়ে উঠে পা-ঝুলিয়ে আপনমনে কাগজটার ভাঁজ খুলতে লাগলেন। কাগজের ভিতরটা দেখে আমি আর ছোড়দাতো একেবারে পাথর ! হুবহু সেই একই কবিতা লেখা, তফাৎ শুধু এটা কাগজে ছাপা। গুণেনবাবু আমাদের হতভম্ব ভাবটা দেখে বেশ আমোদ পেলেন। "খুব আশ্চর্য হয়েছো নিশ্চয় কাগজটা দেখে ?"

ছোড়দা আমতা আমতা করে বলল, "আপনি এটা কোথায় পেলেন ?"

"ন্যাশেন্যাল লাইব্রেরী থেকে। গুপ্তধন, ১৯০৯, মানে গুপ্তধন পত্রিকায় বেড়িয়েছিল ১৯০৯ সালে।" খেয়াল করলাম গুণেনবাবুর চোখটা কেমন জানি চিক্‌চিক্ করছে।

"কাগজটা একটু দেখতে পারি ?" ছোড়দা জিজ্ঞেস করল।

"নিশ্চয় পারো।" গুণেনবাবু ছেড়দার হাতে কাগজটা দিয়ে কোঁচা দিয়ে এবার মুখের ঘাম মুছলেন, "উঃ কি প্যাচপ্যাচে গরম রে বাবা !"

আমি ছোড়দার পাশে দাঁড়িয়ে কাগজটা দেখছিলাম। প্রথমেই খেয়াল হল, কবিতার নিচে রাস্তার কোনও ছবি নেই। তার বদলে রয়েছে অন্য একটা ছবি। ছবিটা একটু অদ্ভুত ধরনের। মোষ জাতীয় একটা জানোয়ারের অনেকগুলো মুখ পাশাপাশি আঁকা। ছবিটা এতই খাপছাড়া যে কবিতার সঙ্গে ছবিটার আদৌ কোনও যোগ আছে কিনা সন্দেহ। আরেকটা প্রশ্ন মাথায়

এল। চিল কোঠায় পাওয়া কাগজটায় রাস্তার মত দেখতে আঁকা লাইনগুলো তাহলে এলো কোত্থেকে ?

"গুপ্তধন পত্রিকাতে বুঝি গুপ্তধনের কথা থাকতো ?" ছোড়দা ভ্যাবলাকান্তের মত মুখ করে খবর বের করতে চাইল।

"এক আধ সময়," গুণেনবাবু বললেন, "বেশিরভাগ সময়ই থাকতো অ্যাডভেঞ্চার জাতীয় গল্প।"

"আমি কিন্তু কখনো শুনিনি পত্রিকাটার নাম।"

"শুনবে কি করে, 'গুপ্তধন' বন্ধ হয়েছে ১৯১২ সাল। জন্মেছো তখন ?"

প্রশ্নটা অবান্তর। আমার বয়স পনেরো, আর ছোড়দার সতেরো।

"এতো আর আজকের ঘটনা নয়," বলে গুণেনবাবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলেন, "ওই যাঃ, ছ-টা বাজতে চলল, আরেকটু দেরি হলেই সাতটা পঁয়ত্রিশের ট্রেনটা মিস কোরবো। দাও, দাও, কাগজটা দাও,...তোমাদের জ্বালায়... !"

ছোড়দার কাগজটা ফেরৎ দেবার ইচ্ছে ছিল না একদম। তবু গুণেনবাবু ইটের পাঁজা থেকে নেমে পড়াতে ভদ্রতাকরে কাগজটা এগিয়ে দিল। গুনেনবাবু হঠাৎ কি জানি কি ভেবে বললেন; "রাখতে চাও নাকি ওটা ?"

"আপনার লাগবে না ?"

"নাঃ, খুঁজে খুঁজে অনেক হয়রান হয়েছি, ভাবছি আর নয়।"

"অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছেন বুঝি ?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"আরে না, এতো কিছুই নয়। বললে বিশ্বাস করবে, গত সাতেরো বছর ধরে শুধু গুপ্তধনই খুঁজে বেড়াচ্ছি ? কাশ্মীরের জঙ্গল থেকে সুরু করে ব্রহ্মপুত্রের চড়া পর্যন্ত চষেছি। কিন্তু কি পেয়েছি জানো ?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"কচু,লবডঙ্কা।" বুড়ো আঙ্গুলটা তুলে ধরে দেখালেন গুণেনবাবু।

"পয়সার শ্রাদ্ধ করেছি গুপ্তধনের পিছনে। আজ টাকাগুলো থাকলে কালী ঘোষের মত পেট্রলপাম্প খুলে লালে লাল হয়ে যেতে পারতাম। দূর, দূর !" মুখটা পচা আলুর মত করে চুপ করলেন গুণেনবাবু। আমি-ছোড়দা দুজনেই স্তব্ধ। "থাক গে, কি হবে শুনে দুঃখের কথা !" প্রায় ঝড়ের বেগে গুণেন দত্ত অদৃশ্য হলেন। ছোড়দার হাতে রয়ে গেল কবিতা ছাপা কাগজটা।

গুণেনবাবুর কথাগুলো শুনে আমার উৎসাহটা বেশ ঝিমিয়ে পড়েছিল। ছোড়দাও দেখি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। খানিকবাদে বলল, "ভদ্রলোক ভুল কিছু বলেন নি, অনেক সময় নষ্ট হয় এসব ব্যাপারে।"

মনটা মুষড়ে পড়ল। তবে কি ছোড়দাও হাল ছেড়ে দিল ? খানিক চুপ থেকে আমি আস্তে আস্তে বললাম, "তবে কি বাড়ি ফিরবি ?"

"সেটাই মনে হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। চল একটু এদিক ওদিক ঘুরে চলে যাই।"

এদিকটায় আমরা বেশি আসিনি। জায়গাটা ঝোপঝাড়ে ভরা। তাই ইঁটের পাঁজার উপরে উঠে, পা ফেলে ফেলে হাঁটছি। পাঁজাটা আরেকটু দূরে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখান থেকে শুরু হয়েছে জঙ্গল। জঙ্গলটা হচ্ছে বাঘপোতার জমিদারদের সম্পত্তি। আমার বন্ধু বেবী, ওখানে একবার আম পাড়তে গিয়ে নাকি কেউটে সাপ দেখেছিল। গুল দিয়েছিলো কি না কে জানে ? কিন্তু তারপর থেকে আর ও পথ মাড়াই না। দুজনে চুপচাপ হাঁটছি। ছোড়দা কি ভাবছে জানি না। আমি ভাবছি গুপ্তধন আর গুণেনবাবুর কথা। অদ্ভুত লোকতো ! সাতেরো বছর ধরে শুধু গুপ্তধন খুঁজে বেড়িয়েছেন ? গুপ্তধন পেতে কার না সাধ হয়। কিন্তু তাবলে এত সময় কেউ খর্চা করে তার পিছনে ? বিশেষ করে বড়রা। আমি রহস্য ভালোবাসি ঠিকই, কিন্তু আমিও কখনো একাজে এত সময় দেবো না। এক-আধদিন খোঁজাখুঁজি করা যায়। তেমন বড়সড় কিছু হলে বড়জোর একমাস। তাও পুরো সময়ের জন্য নয়। স্কুল-কলেজ, চাকরি-বাকরি, এসবও তো থাকবে। অবশ্য কথাগুলো গুণেনবাবু বানিয়ে বলেছেন কিনা কে জানে। লোকটা যে একটু খ্যাপাগোছের, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এইসব সাতপাঁচ ভাবছি, হঠাৎ শুনি ছোড়দা বলছে, "এই বুবু, দ্যাখতো ওদিকে।" তাকিয়ে দেখি একটু দূরে ইঁটদিয়ে উঁচুকরা চৌকোমত একটা জায়গা। তার মাঝখানে মনে হচ্ছে একটু গর্ত মতন। বুঝলাম না এরমধ্যে কি দেখার আছে।

"দেখছিস না ইঁটগুলো কেমন সিঁড়ির মত সাজানো," ছোড়দার গলার স্বর একটু অধৈর্য্য শোনাল।

এবার আমি ভালো করে খেয়াল করলাম। সত্যি সত্যিই ইঁটগুলো কেমন একটা ঘোরানো সিঁড়ির মত করে সাজানো। শুধু গোলভাবে ন ঘুরে চৌকো

ভাবে ঘুরছে। কিন্তু সবচেয়ে গোলমেলে হল, সিঁড়িগুলো দেখলে মনে হয় ধাপে ধাপে উঠে গেছে বা নেমে গেছে। কিন্তু যতই চক্কর খাওয়া যাক না কেন, ওঠাও যাবে না, নামাও যাবে না। হে ভগবান! এই তো কবিতার সেই সিঁড়ি!
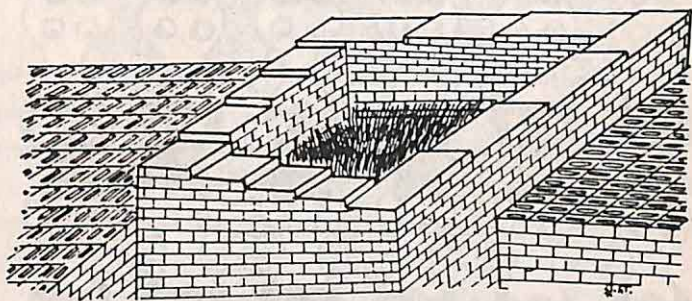
"ছোড়দা!" আমি চিৎকার করে উঠলাম। ছোড়দার মুখচোখ দেখি জ্বলজ্বল করছে। তবু উত্তেজনা চেপে ও শান্তভাবে বলল, "যা বুবু, দৌড়ে বাড়ি থেকে একটা টর্চ নিয়ে আয়।"

এইসব যত্ত ফুটফরমাস আমাকেই খাটতে হবে? অন্যসময় হলে তর্ক লাগাতাম, কিন্তু এখন ছোড়দাকে আমার ভীষণ দরকার!

হাঁপাতে হাঁপাতে টর্চ নিয়ে এসে দেখি, ছোড়দা গুণেনবাবুর কাগজে আঁকা ছবিটা মন দিয়ে দেখছে। দেখার থেকে পরীক্ষা করছে বলাই বোধহয় ঠিক।

"কি দেখছিস?"

"ভাবছি ছবিটার মধ্যে কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে নাকি?"

আমি খানিকক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে বললাম, "ছবিটার নিচে দেখছি বেশ কিছুটা মিসিং। হয়তো সেখানেই কোনও 'ক্লু' ছিল।"

ছোড়দা মাথা নাড়ল। "সবই সম্ভব। তবে এও সম্ভব যে, পাতাটা ছেঁড়া ছিল, তাই জেরক্স কপি করার সময় ওটুকু ওঠেনি। বইটাতো কম পুরনো নয়।"

ভেবে দেখলাম কথাটা যুক্তিযুক্ত। পুরনো বই, হাজার লোকে পড়েছে।
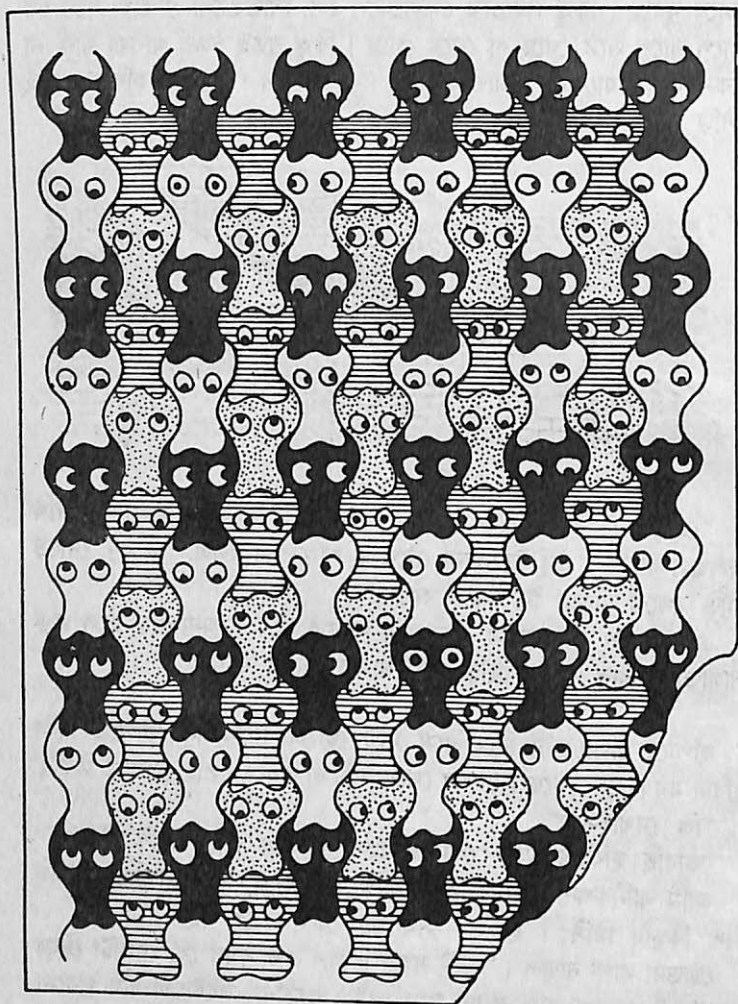
পাতাগুলো সব অক্ষত থাকবে আশা করাটাও অন্যায়। ছবিটাকে আবার একবার ভালোকরে দেখলাম। দেখতে কেমন জানি অদ্ভুত, এমনকি একদিক

থেকে বেশ সুন্দরও। কিন্তু ওটার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই খুঁজে পেলাম না। "আমার তো মনে হয় না পদ্যটার সাথে ছবিটার কোনও যোগ আছে বলে।"

"একদম যে নেই তা বলা যায় না। ধর এক জায়গায় লিখেছে, 'সাদার যে কালোই ভাল।' আর দেখ এই ছবিতে সাদা এবং কালো, দু রংই রয়েছে।"

"কিন্তু সাদা-কালো ছাড়াও তো অন্য রং আছে।"

" তা অবশ্য ঠিক।" ছোড়দা অন্যমনস্ক হয়ে বলল, "তবু যদি ধরিস যে সাদা আর কলোই হচ্ছে আসল ক্লু, আর বলছে তার মধ্যে কালো জন্তুই ভালো। তারপর 'চোখ বরাবর যা চলে', তারমানে কি কালো জন্তুর চোখ বরাবর ?" ছোড়দা আর আমার সাথে কথা বলছে না। জোরে জোরে চিন্তা করছে। তারমানে ভীষণ চিন্তা করছে ! উফ্‌ফ্ ! চোখ বন্ধ করে ভাবলাম, মিলে যা ! মিলে যা ! হঠাৎ মনে হল 'চোখ বরাবর ?' ভালো করে লক্ষ্য করে দেখি জন্তুগুলোর চোখ নানান দিকে ঘোরানো আছে।

"দাদুর কাগজটা দে'তো।"

আমি একটু একটু আঁচ করতে পারছি ছোড়দা কি করতে চায়। কিন্তু এখন বেশি বিদ্যা ফলাতে গিয়ে যদি ওর মুডটা বিগড়ে দিই ! চুপচাপ কাগজটা এগিয়ে দিলাম। ছোড়দা গুণেনবাবুর আর দাদুর দুটো কাগজ পাশাপাশি রেখে হিসেব মিলিয়ে বলল, "এক্স্যাক্টলি ! চেয়ে দ্যাখ, দাদুর কাগজে প্রথম রাস্তা থেকে যতগুলো রাস্তা বেড়িয়েছে, তার সংখ্যা প্রথমসারির কালো মাথার সমান। তারমানে কালোমাথাগুলো রাস্তার এক একটা মোড় বোঝাচ্ছে।" পকেট থেকে পেন বের করে ছোড়দা ডিরেকশন আঁকা সুরু কোরলো, "ব্যাস এইখানে, ঠিক এইখানে !"

"কোনখানে ?"

ছোড়দা ওর আঁকা ম্যাপটার ওপর পেন দিয়ে আমায় বোঝাতে লাগল, কালোজন্তুর চোখ বরাবর যেতে থাক। বুঝলি না ? দ্যাখ বোকারাম, এইখানে এসে জন্তুর চোখ হয়েছে 'ছানাবড়া।' অতএব এর কাছাকাছিই পাথরটা থাকতে হবে।"

"খুব বুঝতে পারছি এখন। ছোড়দা, সত্যিই তুমি গ্রেট !" এই কমিনিটের মধ্যে আমি ভীষণ উত্তেজিত য়ে পড়েছি, "পৃথিবীতে এত ইঁটের পাঁজা থাকতে, এইটেতেই গুপ্তধন লুকিয়ে আছে ? ছোড়দা, তোর আশ্চর্য লাগছে না ?" ছোড়দার ভিতরে কি হচ্ছে জানি না, কিন্তু বাইরে ও এখনও ধীরস্থির,

"দাঁড়া, দাঁড়া, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। কি করে জানলি যে আমরা ঠিক ?"

আমি কিন্তু ভুল বলিনি। ইঁটের সিঁড়ি ঘেরা জায়গাটার মধ্যে লাফিয়ে পড়তেই দেখতে পেলাম সেই সুড়ঙ্গের মুখ। সুড়ঙ্গটা বাঁধানো। তবে বহুদিনের পুরোনো বলে খাবলা খাবলা ভেঙ্গে গিয়ে তলার ইঁট দেখা যাচ্ছে। আগাছাটাগাছাও গজিয়েছে প্রচুর। সামনের অল্প একটু জায়গাতেই যেটুকু আলো আছে, ভিতরটা ঘুটঘুট্টি অন্ধকার ! মাকড়সার জাল, সাপখোপ, বাদুড় কি যে সেখানে আছে কে জানে ! কিন্তু এখনতো ওসব ভয় করলে চলবে না ! ঘাড়টাড় গুঁজে টর্চ জ্বেলে ছোড়দার ম্যাপ ফলো করে আমরা শেষপর্যন্ত যেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম, সেখানে পথ জুড়ে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড পাথর। দুজনে মিলে 'হেইও' বলে পাথরটাকে ধাক্কা দিতেই সেটা গড়িয়ে গড়িয়ে অনেকদূর চলে গেল। আরে, কি আশ্চর্য ! দেখি পাথর তলায় বেশ বড়সড় একটা গর্ত, আর তার ঠিক মাঝ দিয়ে নেমেছে একটা সিঁড়ি !

॥ দুই ॥

সিঁড়িটা এঁকেবেঁকে নেমে একটা বড় ঘরের মধ্যে এসে থেমেছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে কেটা ভাঙা টেবিল, আর কয়েকটা চেয়ার। এছাড়া আর কিছু নেই। চেয়ারে বসে একটা বুড়োমত লোক কাগজে হিজিবিজি অনেক কিছু হিসাব করছে, আর 'উঃ', 'আঃ' করে বিরক্তি প্রকাশ করছে। আমি আর ছোড়দা যে ধুপধাপ করে সিঁড়ি দিয়ে নামলাম, তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। ছোড়দা সামনে গিয়ে দু-একবার গলা খ্যাঁকারি দিল। বুড়োটা চোখও তুলল না। আমি বললাম, "শুনছেন ?" বুড়ো একবার ছাদের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে, পেন্সিল দিয়ে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে মাথা চুলকে, আবার হিসাব সুরু করল। আমি আর ছোড়দা চোখ চাওয়াচায়ি করে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, "মশাই, শুনছেন ?"

আমাদের চ্যাঁচানি শুনে বুড়ো চেয়ার টেয়ার ঠেলে উল্টে পড়ে যায় আর কি ! সামলে উঠে বলল, "আঃ, চ্যাঁচাচ্ছ কেন, আমি কি কালা ?"
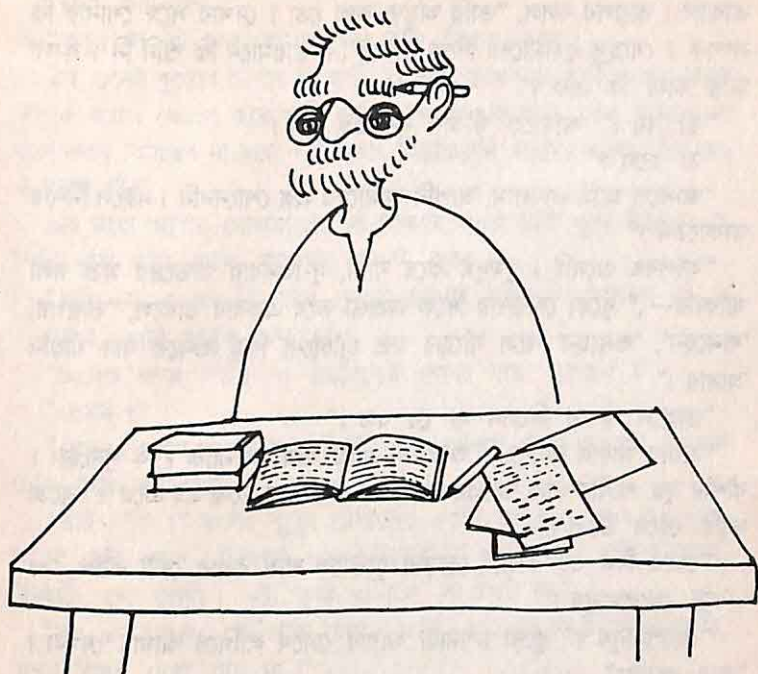
পনেরো।"

"ও আচ্ছা," বলেই আবার কাগজ টেনে হিসাব শুরু করল। ওর ব্যবহার দেখে আমি তো হতভম্ব! বাইরের থেকে দুটো ছেলেমেয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, অন্ততঃ কি দরকার সেটাও তো জিজ্ঞাসা করবে?

"ধাঁধাপুরীটা কোনদিকে জানেন?" ছোড়দা ভণিতা না করে সোজাসুজি প্রশ্ন করল।

"জানি!" বুড়ো হিসেব থেকে চোখ তুলল না।

"পথটা দেখিয়ে দেবেন আমাদের?"

"কি করে বুঝবো? আমরা হুড়মুড় করে নামলাম, আপনি একবার তাকিয়েও দেখলেন না।"

আমার কথা শুনে বুড়ো তার চশমাটা চোখ থেকে খুলে পিটপিট করে

তাকাল। তারপর বলল, "ভারি অদ্ভুত কথা তো! দেখার সঙ্গে শোনার কি সম্পর্ক? যেহেতু তোমাদের দিকে তাকাই নি, তারমানে কি শুনি নি? কালা আর কানা কি এক?"

"তা নয়?" আমাকে স্বীকার করতেই হল।

"তা হলে?"

"আসলে আমি ভাবলাম, আপনি আমাদের প্রশ্ন শোনেননি। নইলে নিশ্চয় তাকাতেন।"

"আলবৎ শুনেছি। দুম্‌দুম্ করে নামা, দু-তিনবার অভদ্রের মত গলা খ্যাঁকারি—," বুড়ো ছোড়দার দিকে অশ্রদ্ধা ভরে একবার তাকাল, "তারপর, 'শুনছেন', 'শুনছেন' বলে ষাঁড়ের মত চ্যাঁচানো কিছু শুনতে বাদ যায়নি আমার।"

"তাহলে জবাব দিলেন না যে বড়?"

"জবাব আবার কিসের? 'শুনছেন' একটা প্রশ্ন হল নাকি? কি শুনছেন? বাঁশীর সুর, পাখীর ডাক, জলের শব্দ, কার কথা বলা হচ্ছে এই প্রশ্নে?" বুড়ো ভারি রেগে উঠল।

"যেতে দিন ওর কথা," ছোড়দা বুড়োকে শান্ত করার চেষ্টা করল, "ও একটা ছেলেমানুষ।"

"ছেলেমানুষ?" বুড়ো চশমাটা আবার চোখে লাগিয়ে আমায় দেখল। "কত বয়েস?"

"না।"

"না কেন?"

এবার কলম নামিয়ে বুড়ো ছোড়দার দিকে তাকাল, "কি লাভ আমার?" ওরে বাবা! একদম দুকান কাটাতো! পথ দেখাতেই লাভ-লোকসান হিসেব করতে হবে? ছোড়দাও প্রশ্নটাতে থতমত খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও-কে কাৎ করা অত সহজ নয়। চট করে সামলে নিয়ে বলল, "আপনি আমাদের সাহায্য করলে, আমরাও আপনার উপকার করতে পারি।"

কথাটা শুনে বুড়ো ওপরের দিকে তাকিয়ে কি জানি একটু ভাবল, "বেশ। তবে ধারে আমি কারবার করি না, সব নগদ নগদ। আগে আমায় সাহায্য কর, তারপর আমি তোমাদের সাহায্য করব। রাজী?"

মুখ চাওয়াচায়ি করে বললাম, "রাজী।"

"ঠিক করবেতো ?"

"বলুন না কি চান, অসম্ভব না হলে নিশ্চয় করব।"

এই শুনেই বুড়োর আবার কি জানি কি হল, চোখবুজে বিড়বিড় সুরু করল আপন মনে। খেয়াল করে শুনি বলছে, 'অসম্ভব না হলে করব, অসম্ভব না হলে করব, অসম্ভব না হলে···।" হঠাৎ বিড়বিড়ানি থামিয়ে বলল, "কি অর্থ এ কথার ?"

এর মধ্যে আবার গোলমালের কি থাকতে পারে আমি বুঝে উঠলাম না, "যদি বুঝি করা সম্ভব, অবশ্যই কাজটা করব।"

"চেষ্টা না করলে কি করে বুঝবে কাজটা সম্ভব না অসম্ভব ?"

আরে, ভারি অদ্ভুত কথাতো !

"অনেক কাজ আছে যা এমনিতেই বোঝা যায় 'অসম্ভব'।"

"যেমন ?"

"যেমন," আমি একটা জুৎসউ উদাহরণ খোঁজার চেষ্টা করলাম, "যেমন চোখ বুজে বই পড়া।"

"তাই নাকি ?" বলেই বুড়ো টেবিলের একটা কাগজ তুলে চোখ বুজে পড়ার চেষ্টা করল। তারপর পড়তে-টরতে না পেরে মাথা দুলিয়ে বলল, "কথাটা মন্দ বলনি। এটা তুমি জানলে কি করে ?"

"বাঃ, এর আগেও তো আমি চোখ বুজেছি। ঘুমনোর সময় চোখ বুজেছি, তখন কিছুই দেখা যায় না।"

"কেন, স্বপ্ন তো দেখা যায়," বুড়ো গম্ভীরভাবে বলল।

"সেতো ঘুমনোর পরে। আমি ঘুমিয়ে পড়ার আগের কথা বলছি। তখন কিছুইদেখা যায় না। কিছু যদি দেখা না যায়, তাহলে নিশ্চয় বইয়ের পাতাও দেখা যাবে না। পাতা না দেখার মানে, পাতার লেখাও দেখা যাবে না। অর্থাৎ, বই পড়া যাবে না।"

ছোড়দা আমার পিঠ চাপড়ে বলল, "বেড়ে বলেছিস !"

"থ্যাঙ্কু," ঘুরে ছোড়দার সঙ্গে একবার হ্যান্ডশেক করে নিলাম।

বুড়ো বিরক্ত হয়ে বলল, "হয়েছে, হয়েছে, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। আগে আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দাও, তারপর প্রাণভরে কোলাকুলি কারোগিয়ে।"

আমি বললাম, "তাহলে জল্‌দি জল্‌দি বলুন, আর আমরাও জল্‌দি জল্‌দি

জবাব দিই।"

"বেশ বোসো তোমরা," বুড়ো দুটো চেয়ারদেখিয়ে দিল, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হবে না এগুলো, ভারি ভাবনার বিষয়।"

বুড়োর সঙ্গে খোসগল্প করার ইচ্ছে আমাদের এতটুকুও ছিল না। কিন্তু ওর কাছ থেকেই ধাঁধাপুরীর ডিরেকশনটা নিতে হবে, চটালে চলবে না। কি আর করা, অগত্যা বসে পড়লাম।

চেয়ারে বসতে বুড়ো বলল, "খিদে পেয়েছে, খাবে কিছু ?"

ঘুরে ঘুরে আমার বেজায় তেষ্টা পেয়েছিল। বললাম, "জল খাব একটু।"

বুড়ো পিছন ফিরে হাঁক দিল, "ওরে এক গ্লাস জল নিয়ে আয়।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাগ্যিস আর কিছু চাও নি, কিছু নেই বাড়িতে।"

"তাহলে 'কি খাবো' জিজ্ঞাসা করলেন কেন ?" আমি তো অবাক।

"বলিনিতো 'কি খাবে'। বলেছি 'খাবে কিছু ?' যদি বলতে 'না,' তাহলে তো চুকেই গেল। আমিও ভদ্রতা করলাম, তোমরাও ভদ্রতা করলে। যদি বলতে 'হ্যাঁ', তাহলে বুঝতাম তোমরা অভদ্র। আর আমি বললাম, 'থাকগে এই অবেলায় খেয়ে কাজ নেই, অসুখ করবে'।"

"সেটাতো অভদ্রতা হত !"

"অভদ্রের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার ছাড়া আর কি কোরবো ?"

"তারচেয়ে খেতে না জিজ্ঞেস করলেই পারতেন।"

"বারে বা, তাহলে তো আর ভদ্রতা করা হত না।"

বুড়োর কথাগুলো এক মুহূর্তের মধ্যে কেমন জানি আমাকে গুলিয়ে দিল। গোলমালটা ঠিক কোথায় সেটা বার করার চেষ্টা করছি, তখন শুনি বুড়ো আবার চ্যাঁচাচ্ছে, "ওরে ও ক-খ-গ বলি জল আনলি না ?"

ক-খ-গ নামটা এমন বিদ্‌ঘুটে যে আমি আবার প্রশ্ন না করে পারলাম না, "ক-খ-গ কার নাম ?"

"আমার নাতির।"

"ভারি অদ্ভুত নামতো !" মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেল। ছোড়দা দেখি ইশারায় আমাকে ধমকাচ্ছে।

"নামের আবার অদ্ভুত কি ?" মনে হল বুড়ো চটেছে।

"ক-খ-গ মানে কি ?"

"মানে হচ্ছে আমার নাতি।"

"কিন্তু নামটার তো কোনও মানে হয় না।"

বুড়ো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তোমার নাম কি ?"

"সবিতা।"

"সবিতা মানে কি ?"

"সূর্য্য" গর্বের সঙ্গে বললাম।

"তুমি কি সূর্য্য ?"

"তা কেন হব ?"

"তাহলে সূর্য্যের নাম নিয়ে বড়াই কোরছো কেন ?"

ছোড়দা এদিকে নামের কচ্‌কচিতে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে, "থাকুক ওসব কথা, আগে আপনার প্রশ্নগুলো শুনি।"

"বেশ, কিন্তু দুটো সমস্যা আমার। আর দুটোই বেজায় শক্ত। কোনটে আগে শুনবে ?"

"কোনোটাই আমরা জানি না, সুতরাং যেটা খুশী বলুন।"

বুড়ো ছোড়দার দিকে কয়েক সেকেণ্ড শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে, হঠাৎ শশব্যস্ত টেবিলের কাগজপত্র ছড়িয়ে কি জানি খুঁজতে শুরু কোরলো। তারপর খুঁজেখুঁজে না পেয়ে গেল বিষম চটে। 'কে আমার কাগজ চুরি করেছে, কে আমার কাগজ চুরি করেছে,' বলে চিৎকার, আর সেই সঙ্গে ঠিক বাচ্চাদের মত পা-দুখানা দুম্‌দুম্ করে দাপাতে লাগলো। আমি আর ছোড়দা তো স্তম্ভিত। সান্ত্বনা দেওয়াটা উচিত হবে কিনা ভাবছি, হঠাৎ দেখি বুড়ো চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠেছে। উঠেই টেবিলের পায়া লক্ষ্য করে কশাল বেশ দু-তিনটে লাথি—সঙ্গে সঙ্গে 'গেছি, গেছি' করে আর্তনাদ, আর পপাতধরণীতলে। আমি প্রায় হাতে চিমটি কেটে হাসি চাপছি। ছোড়দাও তথৈবচ, কিন্তু তবু চোখ দিয়ে আমাকে শাসিয়ে বুড়োকে ধরে তুলতে গেল। বুড়ো ওর হাতটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে, যেন এতক্ষণ কিছুই হয়নি ভাব করে, আবার উঠে বসে কাগজ ঘাঁটতে শুরু করল। এবার বোধহয় বুড়ো যা খুঁজছিল, পেয়ে গেল। কাগজটার উপর বেশ কয়েকবার চোখ বুলিয়ে বুড়ো তার গল্প আরম্ভ করল : "একটা লোক ছিল, যার নাম ছিল ব-প-ক। এ নামেরও কোনও অর্থ নেই।" আমার দিকে একটু ট্যারা চোখে তাকালো বুড়ো। এত কীর্তির পরেও আমার কথাটা কিন্তু ভোলেনি। আমি

আর উচ্চবাচ্য করলাম না।

"ব-প-ক ভালো ছবি আঁকতো, আর সে লোকও ছিল ভাল।" তারপর একটুক্ষণ চুপ করে, কাগজটাকে মুখের সামনে কয়েকবার আগুপিছু করিয়ে, ভুরুটা কুঁচকে বুড়ো বলল, "আমার মতে বিরক্তিকর রকমের ভালো।" এই গতিতে চললে আজ ধাঁধাপুরীতে যাওয়ার আশা শিকেয় তুলতে হবে।

"সংক্ষেপে শুধু প্রশ্নটা বলুন না, আমাদের একটু তাড়া আছে।" ছোড়দা মিনতির সুরে কথাটা বলল।

"আচ্ছা, আচ্ছা, বলছি।...এখানে লিখেছে যে লোকটা কারোর কোনও কষ্ট একদম সহ্য করতে পারতো না। এমনকি কেউ কোনও কারণে তাকে হিংসা করে কষ্ট পাচ্ছে, এটাও সে সহ্য করতে পারতো না।"

"বুঝতে পেরেছি, তারপর ?" ছোড়দা চেষ্টা চালাচ্ছে গল্পটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে নেবার।

"তারপর ?...ও হ্যাঁ, রাজা একদিন ব-প-ক'র আঁকা ছবি দেখে এত খুশী হলেন যে সব ছবিতো কিনে নিলেনই, এছাড়া ও-কে রাজসভায় মোটা মাইনের একটা চাকরিও দিলেন। ফল হল এই যে অনেকেই ও র সৌভাগ্য দেখে হিংসা শুরু কোরলো। ব-প-ক সেটা বোঝা মাত্রই রাজসভা ছেড়ে দিয়ে নিজের গ্রামে চলে গেল। মনে রেখো, ব-প-ক কারোর কষ্ট সহ্য করতে পারতো না। এদিকে মুশকিল হল যে এখন সবাই ও-র নাম জেনে গেছে। দেশ বিদেশ থেকে নানান লোক ছবি কিনতে গ্রামে আসতে আরম্ভ করলো। সেই না দেখে গ্রামবাসীরা...।"

"হিংসা শুরু কোরলো," ছোড়দা বলল।

"ঠিক ধরেছোতো !...ব-প-ক বুঝতে পারলো যে ছবিই হচ্ছে নষ্টের গোড়া। সে ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে, অন্য একটা গ্রামে গিয়ে চাষবাসে মন দিল। কিন্তু সেখানেও হল মুশকিল। ও-র হাতের গুণে খরা জমিতে সোনা ফলল...।"

ছোড়দা বুড়োকে থামিয়ে বলল, "বুঝতে পেরেছি, তার ফলে অন্যান্য চাষীদের হিংসা হল।"

"খাঁটি কথা," ছোড়দার প্রেডিক্‌শনের ক্ষমতা দেখে বুড়ো অবাক হয়েছে মনে হল, "এবার ব-প-ক তিতিবিরক্ত হয়ে সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে শুধু একটা কৌপিন পরে রাস্তায় নেমে পড়ল। ভিক্ষা করে যা পেত, তাতেই দিব্বি চলে

যেত। আর সবচেয়ে সুখের কথা কি ছিল বলতো ?" আমি আর ছোড়দা একসঙ্গে বললাম, "কেউ তাকে হিংসা কোরতো না।"

"অতি অবশ্য, অতি অবশ্য। তোমরা চেন নাকি ব-প-ক-কে ?" বুড়ো জিজ্ঞাসা কোরলো।

"না, কিন্তু তারপর ?"

"তারপর আবার কি ? এবার সে সত্যিই সুখী হল।" বুড়ো চুপ। মনে হল ব-প-ক-র সুখী জীবনের কথা ভাবছে ! ছোড়দা একটু উসখুস করে বলল, "এর মধ্যে সমস্যাটা কোথায় ?"

"ওই যাঃ, সেটাইতো বলিনি !" বুড়ো ব্যস্তসমস্ত হয়ে কাগজগুলো আবার ঘাঁটতে শুরু কোরলো। খেয়েছে রে আবার আগের কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি না হয় ! এবার তাহলে হাসি চাপাটাই মুশকিল হবে। বলতেকি হাসিটা অলরেডি পেটের মধ্যে গুড়গুড়োচ্ছে ! কিন্তু তা হল না। বুড়ো চটপট আর একটা কাগজ টেনে বার করে বলল, "হ্যাঁ সমস্যাটা পেয়েছি, মন দিয়ে শোনো। হঠাৎ একদিন ব-প-ক-র সঙ্গে রাজার দেখা হল। রাজকর্মের চাপে রাজার চুল-দাড়িতে পাক ধরেছে, কপালে ভাঁজ পড়েছে, শরীর কুঁজো হয়ে গেছে। রাজাতো ব-প-ক-র চেহারা দেখে অবাক। বললেন, 'ইস্‌স্‌, তোমাকে দেখে আমার যা হিংসা হচ্ছে যে কি বোলবো ! তোমার মত যদি আমি সুখী হতে পারতাম !' "এইটুকু বলে বুড়ো পেনসিলের উল্টোদিক দিয়ে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে কিছুক্ষণ মাথা চুলকোলো। তারপর চশমার উপর দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "এবার তাহলে সমস্যাটা বুঝেছোতো ? এখন ব-প-ক কি করে ? সব কিছুতো সে ছেড়েছে, আর কি ছাড়তে পারে ?"

কি বিদঘুটে সমস্যা রে বাবা ! এমন প্রব্লেম কারোর হতে পারে জীবনে ভাবিনি। আমি গালে হাত দিয়ে আকাশ পাতাল ভেবেও হদিশ করতে পারলাম না। ছোড়দা দেখি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের চারিদিকে হনহন করে হাঁটতে শুরু করেছে। গভীর কিছু চিন্তা করতে হলেই ও এরকম করে। বুড়োও দেখি আগের মত 'উঃ', 'আঃ' শুরু করেছে। হাল ছেড়ে দিয়ে আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, হঠাৎ নজরে পড়ল ঘরের ঠিক দু-কোনে ছোট্ট দুটো জানলা, আর জানলার পাশে একটা করে বেঁটে মত দরজা। জানলার কাঁচটা স্বচ্ছ নয়, কেমন জানি ঘষা ঘষা। তবে তার ভিতর দিয়ে বাইরের আলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এটা খুব রহস্যজনক লাগলো আমার কাছে।

হিসাব অনুযায়ী এই ঘরটা মাটির থেকে অন্ততঃ কুড়ি ফুট নিচে। তাহলে বাইরের আলো এল কোত্থেকে ? হয়তো খুব পাওয়ারফুল নিয়ন জাতীয় কোনও লাইট-টাইট হবে ! এইসব সাতপাঁচ ভাবছি, হঠাৎ ছোড়দা লাফিয়ে উঠল, "ইউরেকা।"

ও-র চিৎকারে বুড়ো আবার চমকে চেয়ার থেকে পরে যায় আর কি ! "সেটা আবার কি।"

"তার মানে উত্তরটা পেয়ে গেছি।"

"এত তাড়াতাড়ি ?" মনে হল বুড়ো একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

"চিন্তা করতে গেলে আপনার প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটা রয়েছে"।

"কি রকম ?"

"উত্তর হবে, ব-ত-ট-র...।"

"ব-প-ক", বুড়ো শুধরে দিল।

"সরি, ব-প-ক-র আর কিচ্ছু করার নেই। কারণ তার টাকাকড়ি, সম্মান-টম্মান, সব কিছু চলে গেছে, সুতরাং সেইজন্য কেউ তাকে হিংসা করবে না। আর তার মনের যেটুকু সুখ ছিল, রাজার কথায় সেটাও নষ্ট হয়েছে। সুতরাং সুখী বলেও কেউ আর তাকে হিংসা করতে পারবে না। তাহলে সমস্যার রইলোটা আর কি ?"

ছোড়দার কথা শুনে বুড়োর চোখটা কেমন জানি ঘোলা ঘোলা হয়ে গেল। বলল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, অত তাড়াহুড়ো কোরো না। আস্তে আস্তে বল, আমি লিখে নিই।"

গুটি গুটি করে পুরোটা লেখার পর, বুড়ো সেটা মাথা নেড়ে নেড়ে বার কয়েক নানান সুরে পড়ল। তারপর চশমাটা নাকের ডগায় টেনে নামিয়ে ছোড়দার দিকে তাকিয়ে বলল, "জবাবটাতে কেমন জানি একটা ফাঁকিঝুঁকি আছে মনে হচ্ছে।"

মনে হল বুড়ো বড্ড খুঁতখুঁতে। "এর মধ্যে আবার ফাঁকিঝুঁকি কোথায় ? উত্তরটাতো আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার।" বুড়ো চশমাটা ঠিক করে উত্তরটা আবার বিড়বিড় করে পড়ল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "নাঃ, এটা মনে হচ্ছে ঠিক-বেঠিক দুটোই।"

এরকম অদ্ভুত কথা কেউ কখনো শুনেছে ! লোকটা শুধু আধ্‌খ্যাপা নয়, একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। অথচ ভাবটা কিন্তু একেবারে সবজান্তার মত। আমি

রেগে বললাম, "উত্তর হয় ঠিক, নয় বেঠিক। দুটোই কি করে একসঙ্গে হতে পারে ?"

বুড়ো আমার দিকে কুতকুত করে তাকিয়ে বলল, "কেন হতে পারে না, অসুবিধাটা কোথায় ?"

"সেটা হওয়া অসম্ভব !"

"আঃ, আবার তুমি 'সম্ভব-অসম্ভব' এনে ফেলছো ! কি করে জানলে সেটা অসম্ভব ?"

"এটার মধ্যে আবার জানাজানির কি আছে ? এমন উদ্ভট ব্যাপার কখনো হতে পারে নাকি !"

"আলবৎ পারে," বুড়ো বলল, "ধর, তোমাকে যদি আমি বলি যে মণ্ডলপুরের মোড়ল বলেছে, 'মণ্ডলপুরের সব্বাই মিথ্যুক।' তার থেকে তুমি কি বুঝবে ?"

"এরমধ্যে আবার গোলমাল কোথায় ? এর মানে মণ্ডলপুরের সবাই মিথ্যেকথা বলে।"

"কিন্তু সেটাতো সত্যি নয়। সেক্ষেত্রে মোড়লের কথাটা সত্যি হয়ে যায়, আর মোড়ল নিজে হচ্ছে মণ্ডলপুরের লোক। মণ্ডলপুরের লোক হয়ে সে কি করে সত্যিকথা বলে ?" বুড়ো দেখি আমাকে কথার ফাঁসে ফেলে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে।

"আচ্ছা বেশ", গম্ভীর হয়ে আমি বললাম, "যদি ধরি মোড়ল মিথ্যেকথা বলছে ?"

"তাহলে মোড়লের কথা, অর্থাৎ, 'মণ্ডলপুরের সব্বাই মিথ্যুক', এই কথাটা মিথ্যা হয়ে যায়। তারমানে মণ্ডলপুরের সবাই সত্যবাদী। তাই যদি হয় তাহলে সেখানকার মোড়ল হয়ে সে কি করে মিথ্যাকথা বলে ?"

যুক্তিগুলো এত জোরালো যে আমার ধাঁধা লেগে গেল। কিন্তু বুড়োর কাছে হার মানতে আমার একদম ইচ্ছে কোরলো না। বললাম, "এটা নিয়ে একটু ভাবতে হবে।"

বুড়ো আমার জবাব শুনলো, কি শুনলো না বুঝলাম না।

সে আবার ছোড়দার উত্তরটায় চোখ বুলিয়ে বলল, "যাক্, রাজার পছন্দ হলেই হল।"

ছোড়দা জিজ্ঞেস করল, "রাজা কে ?"

বুড়ো চোখ কপালে তুলে বলল, "রাজত্বে বাস করছ, রাজা কে জান না ?"

"আমরা এখানকার লোক নই, আসছি দমদম থেকে।

এইটে শোনামাত্র বুড়ো বিষম ব্যস্তট্যাস্ত হয়ে টেবিলের কাগজপত্রগুলোকে একটা ঝোলার মধ্যে পুরতে শুরু করল, "সর্বনাশ, আমার ফাঁসী হবে, আমার ফাঁসী হবে !"

"কি বিপদ ! ফাঁসী হবে কেন ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"বাঃ, দেশের গোপন খবর তোমাদের দিয়ে দিলাম যে ?"

"এর মধ্যে আবার গোপন কি আছে, আর আমরা এগুলো জেনে করবই বা কি ?" ছোড়দা বলল।

"তার মানে তোমরা গুপ্তচর নও ?"

"তাহলে এখানে এসেছো কেন ?"

আমি বললাম, "বয়ে গেছে গুপ্তচর হতে।

বললাম যে গুপ্তধনের খোঁজে।"

"উহুঁ, তা তোমরা বল নি। জানতে চেয়েছিলে ধাঁধাপুরীর পথ কোনদিকে," বুড়োর সন্দিগ্ধ ভাবটা মোটেই গেল না।

"কি মুশকিল, ধাঁধাপুরীতে না গেলে গুপ্তধন পাবো কি করে ? সেখানেই তো গুপ্তধন লুকোনো আছে।"

বুড়ো ঝোলাটা আরও আঁকড়ে ধরে বলল, "কে বলেছে তোমাদের এসব কথা ?"

আমি সঙ্গে সঙ্গে কামিজের পকেট থেকে ম্যাগাজিনের কাটিংটা বার করে দেখালাম। খেয়াল হল ছোড়দা আমাকে চোখ টিপে ওটা দেখাতে বারণ করছে। দেখিয়ে ফেলেছি, কি আর করা !

বুড়ো কাগজটার উপর চোখ বুলিয়ে হাঁফ ছেড়ে বসল, "তাই বল। তার মানে তোমাদের পারমিট আছে।"

কিসের পারমিট, কোথাকার পারমিট, এ সম্বন্ধে আমার নানান প্রশ্ন জাগছিল। কিন্তু বুড়ো সন্তুষ্ট হয়েছে দেখে, এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করলাম না।

"ভারি চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে তোমরা। আমার আবার হার্টের ব্যামো

কিনা, দুশ্চিন্তা করতে ভয় পাই।”

“তাহলে দুশ্চিন্তা না করলেই পারেন।” ছোড়দার গলায় ফাজলামীর সুর।

বুড়ো সেটা ধরতে পারল না, “কথাটা মন্দ বলনি। লোকে বলে দুশ্চিন্তা না করলে নাকি সুখী হওয়া যায়। কিন্তু তাতে অসুবিধাও আছে।”

“অসুবিধা আবার কিসেব ?”

“যারা দুশ্চিন্তা করে না, গা এলিয়ে দিয়ে জীবন কাটায়, তারা বড় অসতর্ক আর অসাবধানী হয়। তার ফলে মাঝেমধ্যেই বড় বড় বিপদের মধ্যে পড়ে। সেটাও ভাল নয়।”

“কোনটা তাহলে ভাল, অসুখী হওয়া, না সুখী হয়ে এক-আধ সময় বিপদের মধ্যে পড়া ?” আমিও যে প্রশ্নের জালে বুড়োকে জব্দ করতে পারি সেটা বোঝান দরকার।

“কে জানে,” বুড়ো হাত ওল্টালো, “আমার মুশকিল হচ্ছে, সবাই বলে আমি নাকি একদম দুশ্চিন্তা করি না। আর সেই নিয়েই আমার সর্বদা দুশ্চিন্তা।”

এরমধ্যেও কেমন জানি একটা প্যাঁচ লুকিয়ে আছে ; সেটাকে উদ্ধার করতে যাব, তখন দেখি ছোড়দা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলছে, “বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে, এবার আপনার পরের প্রশ্নটা বলুন।”

“ও, হ্যাঁ, এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটা, “বলেই বুড়ো আবার কাগজ খুঁজতে শুরু করল। এই এক যন্ত্রণা ! কিছুক্ষণবাদে কাগজটা না পেয়ে বলল, “নাঃ, কাগজের দরকার নেই। বেশ মনে আছে আমার। হুঁসিয়ার হয়ে শোন : রাজসিং, ভীম সিং, আর জয় সিং মরুভূমির মাঝখানে তিনটে তাঁবু ফেলে রাত কাটাচ্ছে। রাজ সিং-এর বহুদিনের ইচ্ছে জয় সিংকে খুন করা।”

“কেন ?” আমি প্রশ্ন করলাম।

“আঃ, যতসব অবান্তর প্রশ্ন। এসব বালখিল্যদের কিছু বলাও বিপদ !”

“ভেরি সরি, আপনি বলুন !”

ছোড়দা কড়া চোখে তাকাল আমার দিকে। আমি মুখে চাবি আঁটছি এখন থেকে !

“কি বলছিলাম জানি ?”

“রাজ সিং জয় সিংকে খুন করতে চাচ্ছিল।”

“ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে।...জয় সিং যখন ঘুমচ্ছে, তখন রাজ সিং চুপিচুপি

তার তাঁবুতে ঢুকে, খাবার জলে বিষ মিশিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে অদৃশ্য হল। এদিকে ভীম সিং-ও জয় সিংকে মারার ফন্দি করছিল। রাজ সিং বেরিয়ে যাবার একটু পরেই সে জয় সিং-এর তাঁবুর ভিতরে ঢুকল। ভীম সিং ঠিক করেছিল যে সে জয় সিং-এর খাবার জল ফেলে দেবে, যাতে তেষ্টায় জয় সিং মারা যায়। কাজটা সেরে ভীম সিং-ও পালাল। এর ক'দিন বাদে জলের অভাবে জয় সিং মারা গেল। এই হচ্ছে ঘটনা।

"কষ্টের মৃত্যু," ছোড়দা মন্তব্য করল।

"তা বটে, কিন্তু আমার তাতে দুঃখ নেই। ব্যাটা ছিল খুনে আর জঘন্য চরিত্রের লোক।"

"তাহলে তো মরে ভালই হয়েছে।"

"হয়েছে আমার মুণ্ডু! মরে আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে গেছে। আমাকে এখন বার করতে হবে যে খুনী কে।"

"এটা আবার একটা সমস্যা হল নাকি, "আমি বললাম, "অবশ্যই ভীম সিং খুনী।"

"কেন?"

"জয় সিং তো বিষ খেয়ে মরেনি, মরেছে তেষ্টায়।"

বুড়ো মাথা নাড়ল, "তা কি করে হয়, বিষাক্ত জল ফেলে দেওয়ার মধ্যে অন্যায়টা কোথায়?"

"তা অন্যায় নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে...।" আমার কথা শেষ হবার আগেই বুড়ো বলল, "ভেবে দেখ, ভীম সিং জলটা ফেলে না দিলে, জয় সিং জল খাওয়ামাত্রই মরত—তাই না? ভীম সিং জল ফেলে দিয়েছিল বলেই জয় সিং অন্তত কিছুদিন বেঁচে ছিল। ভাগ্যে থাকলে কেউ ওই সময়টুকুর মধ্যে এসে ওকে উদ্ধারও করে ফেলতে পারত। তখন আবার তোমরাই বলতে, ভাগ্যিস ভীম সিং ছিল, সেইজন্যেই জয় সিং বেঁচে গেল।"

ছোড়দা বলে উঠল, "এটা আপনি কি বলছেন। ভীম সিং যদি জানত জলটা বিষাক্ত, তাহলে কি সে ফেলত? জয় সিংকে মারবে বলেই সে জলটা ফেলেছিল, আর সেটাই হচ্ছে তার মৃত্যুর কারণ।"

বুড়ো এর উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা ছোট ছেলে এক গ্লাস জল টেবিলের উপর রেখে, বুড়োর কানে কানে কি যেন বলল। তারপর দেয়ালের একটা ফাঁক দিয়ে যেমন করে ঢুকেছিল, তেমনি ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে

গেল। বুড়ো ভীষণ খুসী হয়ে বলল, "ওফ্‌ফ্ বাঁচা গেল!" বলেই কাগজপত্রগুলো আবার থলির মধ্যে ভরতে আরম্ভ করল। ছোড়দা জিজ্ঞেস করল, "কি হল?"

"ঝামেলা সব চুকে গেছে। ক-খ-গ খবর দিল যে জয় সিং তেষ্টায় মরেনি, মরেছে সাপের কামড়ে। তারমানে আমিও বেঁচে গেলাম, আর তোমাদেরও সমস্যাটা নিয়ে ভাবতে হল না!"

কাগজপত্র বগলে করে বুড়ো তাড়াহুড়ো করে চলে যাচ্ছিল। ছোড়দা চট করে পথ আটকে বলল, "কই ধাঁধাপুরীর পথটা দেখিয়ে দিলেন না?"

"ও তাওতো বটে। যাও, ওই কোনের জানলার সামনে গিয়ে তিনবার হাঁচো, তাহলেই পাশের দরজাটা খুলে যাবে।" বলেই বুড়ো হন হন করে দেয়ালের আরেকটা ফাঁক দিয়ে অদৃশ্য হল। ঠিক বুঝলাম না, বুড়ো আমাদের বোকা বানাল কিনা। চোঁ করে জলটা খেয়ে, কিছুটা অবিশ্বাসভরে, খানিকটা নিরূপায় হয়ে, জানলার সামনে নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে তিনবার হাঁচলাম। ওমা! কি আশ্চর্য! দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল।

॥ তিন ॥

দরজা দিয়ে যেখানে এসে পড়লাম, সেটা একটা ফাঁকা মাঠ। মাঠের চারপাশ জুড়ে ছোট ছোট ঝুপরির দোকান। দোকানগুলোর গায়ে নানান ধরনের সাইনবোর্ড ঝুলছে। খেলনার দোকান, খাবারের স্টল, আর্টস-ক্র্যাফ্‌ট্‌স্-এর বুথ, হরেক রকমের শো'—কি যে নেই বলা মুশকিল। সব কিছুই রয়েছে, কিন্তু যাদের জন্য মেলা তারাই নেই। কোথাও কোনও লোক নজরে পড়ল না। কিন্তু সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার হচ্ছে, যখন ইঁটের পাঁজায় ঢুকেছিলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা হব হব; অথচ এখানে আলোর বহর দেখে মনে হচ্ছে ভর দুপুর। সেটা কি করে সম্ভব হল? আর দিন দুপুরই যখন, তখন লোকই বা নেই কেন? গেছে কোথায় সকলে? ছেলেবেলায় পড়া রূপকথার গল্পগুলো মনে পড়ল—ডাইনীবুড়িদের কথা, যারা মরণকাঠি দিয়ে সব্বাইকে ঘুম পাড়িয়ে রাখত। জানি গল্পগুলো বানান। তা সত্ত্বেও, এই ভরা দিনের আলোতেও গা'টা ছম্‌ছম্ করে উঠল। যে দরজা দিয়ে এসেছি, সেটাকে ভাল করে দেখে নিলাম। পালাতে হলে পথটা পরিষ্কার থাকা

দরকার !

দোকানগুলো দরজার ঠিক পাশ থেকেই শুরু হয়েছে। দরজাটার ঠিক গায়ে লাগান একটা দোকানে নিশ্চয় ম্যাজিক শো হয়। সারা দেয়ালজুড়ে 'ম্যাজিক' কথাটা অজস্রবার লেখা আছে। দোকানদার ভুল বোঝার কোনও ফাঁক রাখেনি। তার উল্টোদিকের দোকানটা যে কি, ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। সেখানে সাইনবোর্ড লাগান 'শব্দহীন কথা'। দোকানটা খোলা। সামনেই একটা টেবিল, পাশে পর্দা ঝুলছে। ভিতরে নানান ধরনের স্টেইনলেস স্টিলের যন্ত্রপাতি দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞানের কোনও শো হবে বোধহয়। আমার একটু ঢুকে দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ছোড়দা বাধা দিল। নিশ্চয় কোনও বার্গলার অ্যালার্ম লাগান আছে। পারমিশান ছাড়া ঢুকলে ফ্যাসাদে পড়ব। 'শব্দহীন কথা'-র পাশে মনে হল জন্তুটন্তুদের জামাকাপড়ের দোকান। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। দোকানে টাঙ্গানো জামাগুলো দেখে একটু অদ্ভুত অদ্ভুত লাগছে, তারপর দেখি দেয়ালজুড়ে কুকুর, বেড়াল, খরগোশ—নানান জন্তুদের জামাকাপড় পরা ছবি। খ্যাপামী আর কাকে বলে! দোকানের নামটাও বাহারী, 'পোষা'র পোষাক'। এর পাশের দোকানটার নাম হচ্ছে 'ভাগ্যের খেলা'। তার সামনে এসে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল একটু দূরে, দুটো পোস্টের মাঝে আটকান লম্বা একটা সাইনবোর্ড।
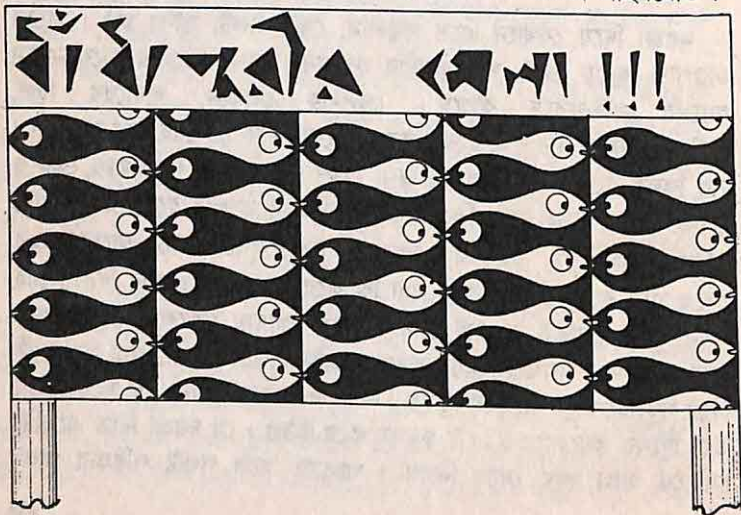
সেখানে বড় বড় করে লেখা 'ধাঁধাপুরীর মেলা'। ঠিক তার নিচে কতগুলো মাছের ছবি। ছবিটা একটু অদ্ভুত ধরনের। একসময় মনে হয় কতগুলো সাদা মাছ ডানদিকে যাচ্ছে ; আবার আরেক সময় মনে হয় কতগুলো কালো মাছ বাঁ দিকে চলেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ দেখলাম ছবিটা। মাছগুলো সত্যি সত্যি কোনদিকে যেতে চায়, তার হদিশ মিলল না অবশ্য ! যাকগে, ধাঁধাপুরীর মেলায় যখন পৌঁছেছি তখন রাজপুরীটা খুঁজে বার করাটাও হয়ত অসম্ভব হবে না। ছোড়দা দেখি ইতিমধ্যে মাঠ থেকে কি একটা কুড়িয়ে মন দিয়ে উল্টেপাল্টে পড়ছে। মাঠের দিকে লক্ষ্য করতেই দেখি অসংখ্য ছোট ছোট কার্ড সেখানে ছড়িয়ে আছে। মনে হয় হেলিকপ্টার বা প্লেন থেকে কেউ ছড়িয়ে দিয়েছে কার্ডগুলো। ছোড়দা তারই একটা তুলে পড়ছে। একটু হেসে ছোড়দা কার্ডটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "দেখ, ভারি মজার !" দেখি কার্ডে লেখা 'এই কার্ডের উল্টোপিঠের লেখা কথাটা ঠিক'। কার্ডটা উল্টে দেখলাম সেখানে লেখা, 'এই কার্ডের উল্টোপিঠের লেখা কথাটা ভুল'। এ আবার কি ধরনের কার্ড ! কার্ডেতো থাকে জানি নিমন্ত্রণের বিষয়। এটাতো মনে হচ্ছে এক ধরনের হেঁয়ালী !

"এর মানেটা কি ?"

"বুঝছিস না ? এটাও সেই খ্যাপা বুড়োর 'মণ্ডলপুরের মোড়লের কথা'র মত, এর কোন মানে নেই।

আমি চুপ করে আছি দেখে, ছোড়দা বোঝাতে লাগল, "যদি ধরিস প্রথম পিঠের কথাটা সত্যি, তাহলে উল্টোপিঠের কথাটা সত্যি হতে হবে। আর উল্টোপিঠের কথাটা সত্যি হওয়া মানে, প্রথম পিঠের কথাটা মিথ্যা। দিব্বি গোলচক্কর !"

"ওরে ত্তারা, এতো বিরাট গেরো রে ছোড়দা ! প্রথম পিঠের কথাটা মিথ্যা হওয়া মানে, উল্টোপিঠের কথাটা মিথ্যা, অর্থাৎ প্রথম পিঠের কথাটা সত্যি।"

"এক্সাক্টলি, কি ভীষণ গোলমেলে বোঝ !"

ছোড়দা সবে কথাটা শেষ করেছে, হঠাৎ একটা লোক কোত্থেকে হুড়মুড় করে এসে আমাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে, দশটা বড় বড় বাক্স পাশাপাশি সাজিয়ে তার উপর পর পর ১, ২, ৩, ইত্যাদি লিখতে শুরু করল। লোকটার গায়ে ফতুয়া, কোমরের লুঙ্গি হাঁটু পর্যন্ত তুলে বাঁধা, পায়ে মোজা আর বুটজুতো। অবাক হয়ে এই দেখছি, এমন সময় শুনি কোথাও একটা ঘড়িতে

ঢং ঢং করে দু'টো বাজল। ঘণ্টার শব্দ মিলিয়ে যবার আগেই কাতারে কাতারে লোক এসে চেঁচামেঁচি হৈ চৈ করে মেলাটা সরগরম করে ফেলল। বাক্সগুলোর চারপাশেও দেখি বহুলোক ঠেলাঠেলি করে দাঁড়িয়ে গেছে। পিছনের থেকে ধাক্কা খেয়ে দেখি আমাদের পিছনেও দু-তিন সারি মাথা দেখা যাচ্ছে। ফতুয়া পড়া লোকটা শেষ বাক্সতে ১০ নম্বর লিখে, মুখে একটা চুরুট ধরিয়ে বলল, "সবাই রেডি ?"

হাফলুঙ্গি, বুট, ফতুয়া আর চুরুটের কম্‌বিনেশন দেখে আমার তো খুক্ খুক্ করে হাসি পাচ্ছে। পাছে হাসি লোকটা বুঝতে পারে, তাই নিজেকেই

নিজে খুব শাসাচ্ছি। ইতিমধ্যে 'ফতুয়া' গলার শিরাটিরা ফুলিয়ে চ্যাঁচাতে শুরু করেছে, "মজার খেলা, মজার খেলা, আসুন, খেলুন, বাক্স বাক্স টাকা জিতে ঘরে চলে যান ! মজার খেলা, মজার খেলা,... ।"

এই ঘ্যানর ঘ্যানর কতক্ষণ চলত জানি না, হঠাৎ পিছন থেকে কে জানি

বলল, "আরে বাপু, বকবকানি থামিয়ে খেলাটাতো কি বলবি ?"

'ফতুয়া' একটু চুপ মেরে, ত্যারছা চোখে সেদিকে একবার তাকিয়ে নিল, "এই দশটা বাক্সের মধ্যে যে কোনও একটাতে একটা পায়রা লুকোনো আছে। বাক্সগুলো একটা একটা করে খুলতে হবে। অর্থাৎ প্রথমে এক নম্বর, তারপর দু' নম্বর, তারপর তিন নম্বর—এইভাবে। প্রত্যেকটা বাক্স খোলার আগে বলে নিতে হবে যে সেই বাক্সে পায়রা আছে কি নেই ! যদি বাক্স খোলার আগে কেউ ঠিক ঠিক বলতে পারে যে ওই বাক্সেই পায়রা আছে, তাহলে তাকে একশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আর তার কথা যদি ভুল হয়, তাহলে আমাকে একশ টাকা দিতে হবে। সবাই বুঝেছেন খেলাটা ? এগিয়ে আসুন ! এগিয়ে আসুন, তাড়াতাড়ি ! ! বড়লোক হবার এমন সুযোগ আর পাবেন না ! ! !

"আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, ছিদাম ! অত তাড়াহুড়ো কোর না," কথাটা বললেন আমাদের উল্টোদিকে দাঁড়ান গোলগাল বেঁটেমত এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের গায়ে গলাবন্ধ কোট, কাঁচাপাকা চুল পাট করে আঁচড়ান, চোখে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মত পাওয়ার ফুল চশমা, আর বিশাল নাকের নিচে হিটলারি স্টাইলের গোঁফ।

"বাক্সগুলো খুলবে কে, তুমি ?" জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

চুরুট মুখে ফতুয়া, অর্থাৎ ছিদাম, চেঁচিয়ে সবাইকে বলল, "স্যার, মানে প্রফেসর ফেনী জিজ্ঞেস করেছেন যে বাক্স কে খুলবে। আমি তার উত্তরে সবাইকে বলছি যে যে-কেউ। আমি, আপনি, প্রফেসর ফেনী, যে-কেউ। এ-খেলার মধ্যে কোনও ম্যাজিক বা কারচুপি নেই, একদম খাঁটি ভাগ্যের খেলা। দাঁড়িয়ে কেন, চলে আসুন দাদারা, শ'য়ে শ'য়ে টাকা নিয়ে যান ! চলে আসুন মায়েরা, দিদিরা ! ভয় পেলে চলবে কেন ! ছোড়দা ফিসফিসিয়ে বলল, "ছিদামটা পয়লা নম্বরের জোচ্চর। ভেবে দেখ, দশটার মধ্যে যে কোনও একটা বাক্সে পায়রা থাকতে পারে। অর্থাৎ তোর পক্ষে ঠিক করে বলা যে কোন বাক্সে পায়রা আছে, তার চান্স হচ্ছে দশভাগের একভাগ। তারমানে তুই যদি দশবার খেলাটা খেলিস, তাহলে অ্যাভারেজে তুই মাত্র একবার জিতবি, বাকি ন'বারই হারবি। আর সেই সুযোগে ছিদাম ব্যাটা বড়লোক হবে।"

আমি অবশ্যই খেলার প্ল্যান করছিলাম না। পকেট দূরে থাক, অত টাকা

আমার ব্যাঙ্কেই নেই। কিন্তু দেখলাম চারিদিকের লোকগুলো কেউই অত বোকা নয়, কেউ আগবাড়িয়ে খেলতে এল না। ছিদাম তখন বলল, "বেশ, বেশ, বুঝেছি একশ টাকায় কেউ খুশী নন। সবাই তাড়াতাড়ি টাকার কুমির হতে চান। সে কথা বললেই হয়! ঠিক আছে, জিতলে আপনাদের না হয় দু'শ টাকাই দেব!"

"আর হারলে?" পিছন থেকে একজন প্রশ্ন করল।

"হারলে সেই এক একশ টাকাই নেব। এর থেকে ভাল খেলা আর কি হতে পারে? জিতলে দু'শ, হারলে একশ। ওফ্‌ফ্‌! এ সুযোগ আর কোথায় পাবেন? তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি! দেরি করলেই ঠকবেন!"

ছোড়দা কানে কানে বলল, "বুঝছিসতো, তাতেও ব্যাটার লাভ!"

ইতিমধ্যে দেখি প্রফেসর ফেনী বাক্সগুলোর একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে প্রাণপণে ছিদামকে কি জানি কি বোঝাবার চেষ্টা করছেন। আমি কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম।

"ওরে ছিদু, এটা একটা খেলাই হল না।"

"কেন স্যার?"

"তুই যদি আমার লজিক ক্লাস ফাঁকি না দিতিস, তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারতিস। কলেজ ছেড়ে ব্যবসা করতে নেমে, তুই দেখছি সর্বস্বান্ত হবি।" প্রফেসর ফেনী একটা হোপলেস ভাব করে মাথা নাড়লেন।

"একটু বুঝিয়েই বলুন না স্যার?"

"বেশ, শোন তাহলে। দশ নম্বর বাক্সে তুই কখনোই পায়রাটা রাখতে পারিস না, পারিস কি?"

"কেন নয় স্যার?

"ধ্যুৎ, তাহলে তো ন' নম্বর বাক্স খোলার পর আমি পরিষ্কার বুঝে যাব যে যেহেতু বাকি রয়েছে কেবল দশ নম্বর বাক্স, সুতরাং পায়রাটাকে সেখানেই থাকতে হবে। তাই সেটা খোলার আগেই আমি তোকে বলে দিতে পারব যে পায়রাটা ওখানে আছে, আর তোরও দু'শ টাকা গচ্চা যাবে।"

"বেশ, না হয় নাই রাখলাম পায়রাটা দশ নম্বর বাক্সে।"

"তারমানে দশ নম্বর বাক্সটা বাদ গেল, কেমন তো?"

"তা গেল।"

"অতি উত্তম," সন্তুষ্ট হলেন প্রফেসর ফেনী, "তাহলে বাকি রইল ন'টা

বাক্স। এবার চিন্তা করা যাক ন' নম্বর বাক্সে পায়রাটা থাকতে পারে কিনা।"

ছিদাম হাসি হাসি মুখে চুপ করে রইল।

"ভেবে দেখ, ন' নম্বর বাক্সেও তুই পায়রাটা রাখতে পারিস না। কারণ যখন আমি এক, দুই, তিন করে আট নম্বর বাক্সটা খুলব, তখন আমি বুঝতে পারব যে পায়রাটা ন' নম্বর বাক্সে আছে।"

"এটা তো পরিষ্কার হল না স্যার।"

"না বোঝার কি আছে এতে ? আমরা আগেই প্রমাণ করেছি যে দশ নম্বর বাক্সে পায়রা থাকতে পারে না, সুতরাং থাকতে হলে ন' নম্বর বাক্সেই থাকতে হবে।"

"তাও তো বটে।"

"সুতরাং বুঝতে পারছিস যে আট নম্বর বাক্স খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বলতে পারব যে ন' নম্বর বাক্সে পায়রাটা আছে। আবার তোর দু'শ টাকা গচ্চা যাবে।"

এবার ছিদাম ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

"এবার চিন্তা কর," প্রফেসর ফেনী উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন, "আট নম্বর বাক্সে পায়রা থাকতে পারে কিনা। যেহেতু দশ নম্বর আর ন' নম্বরে পায়রা থাকা অসম্ভব, সাত নম্বর বাক্স খুললেই আমি বুঝতে পারব যে সত্যি বলতে বাকি রয়েছে আট নম্বর বাক্স, সুতরাং সেখানেই পায়রাটা আছে। এক্ষেত্রেও তোর টাকাটা নষ্ট হচ্ছে।"

ছিদাম মাথা চুলকে বলল, "তাহলে তো বাকি রইল সাতটা বাক্স। কিন্তু দাঁড়ান স্যার, আপনিতো একই ভাবে প্রমাণ করবেন যে সাত নম্বর বাক্সেও পায়রা থাকা অসম্ভব।

"ঠিক ধরেছিস এতক্ষণ, কলেজটা ছাড়লি কেন গোমুখ্যু ! এমনি করে আমি প্রমাণ করব যে ছ' নম্বর বাক্সেও পায়রা থাকতে পারে না, পাঁচ নম্বরেও না, চার নম্বরেও না,...।"

"এতো সর্বনেশে কথা স্যার, তাহলে তো পায়রাটাকে কোনও বাক্সে রাখাই যুক্তিযুক্ত নয়।"

"তাই তো বলছি তোকে, এই খেলায় তুই সর্বস্বান্ত হবি !"

প্রফেসর ফেনীর কথা একদিক থেকে ঠিক মনে হলেও, কোথায় যেন

একটা বিরাট ফাঁক আছে। কিন্তু ঠিক কোথায়, সেটা আমি একদম ধরতে পারলাম না। ছোড়দাকেও দেখলাম ভুরুটুরু কুঁচকে খুব চিন্তা করছে। ছিদামটা এদিকে দেখি মিচ্‌কি মিচ্‌কি হাসছে! তারপর শুনি প্রফেসর ফেনীকে ফিসফিস করে বলছে, "কি আর করা যাবে স্যার, খেলাটা যখন চালু করে ফেলেছি, তখনতো চট করে বন্ধ করে ফেলতে পারি না। যাই হোক এসব কথা আর কাউকে ফাঁস করে দেবেন না। বরং একদান খেলে চলে যান।"

প্রফেসর ফেনী বললেন, "যাকগে, ঠকাই যখন তোর কপালে আছে, তখন আমিই না হয় বউনী করি।"

"বেশতো খুলুন বাক্সগুলো।"

"যেহেতু কোনও বাক্সেই পায়রা থাকতে পারে না, সুতরাং এক নম্বর বাক্সে পায়রা নেই।" প্রফেসর ফেনী এক নম্বর বাক্সটা খুললেন। ওমা! সত্যিই কিছু নেই। দর্শকদের মধ্যে বেশ একটা গুঞ্জন সুরু হল।

"দু' নম্বর বাক্সেও থাকতে পারে না," তিনি বললেন। আবার ঠিক।

"তিন নম্বরেও নয়," বলে প্রফেসর ফেনী যেই বাক্সটা খুলেছেন, একটা সাদা পায়রা দিব্বি ঝট্‌পট্‌ করে উড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলোর কি উল্লাস! হাততালি আর সিটির আওয়াজে কানপাতা দায়। পাশে দাঁড়ান বেঁটেমত একজন লোক চেঁচিয়ে উঠল, "ম্যাজিক, হিপনোটিজম্‌!" তার সঙ্গী বলল, "ঠিক, ঠিক। প্রফেসর ফেনী কখনো ভুল করেন না।" এই সোরগোলের মধ্যে প্রফেসর ফেনী কি বলছেন ঠিক শুনতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম তিনি ঘোরতরভাবে অপদস্থ আর লজ্জিত হয়েছেন। একজন দৌড়ে গিয়ে তাঁকে যেন কি বলল। তিনি তাঁর জবাব দিয়ে মাথাটা একটু নিচু করে, ডানহাতের কনুইটা বাঁ হাতের তেলোর উপর রেখে, গালে হাত দিয়ে কি জানি ভাবতে লাগলেন।

"স্যার আমার একশ টাকাটা দিয়ে দিন এবার," ছিদাম মনে করিয়ে দিল।

ব্যাজারমুখে প্রফেসর এ পকেট ও পকেট হাতড়ে একটা দোমড়ান মোচড়ান নোট ছিদামকে দিলেন। ছিদাম সূর্য্যের আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটাকে দেখে, দু-আঙ্গুলে বার দুই টোকা মেরে, একটা ক্যাশবাক্সে সেটা ভরে ফেলল। তারপর কোত্থেকে আরেকটা পায়রা নিয়ে এসে, লাল চাদর দিয়ে

বাক্সগুলো আড়াল করে, পায়রাটা রাখতে গেল। আমি তখনো প্রফেসর ফেনীর আর্গুমেন্টগুলো চিন্তা করছি, হঠাৎ ছোড়দা বলল, "বুঝতে পেরেছি গলদটা কোথায়।"

"কিসের গলদ ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"প্রফেসর ফেনীর খেলার মধ্যে।"

"বুঝিয়ে বল।"

"প্রফেসর ফেনীর যুক্তিগুলো খুবই খাঁটি। যুক্তিযুক্তভাবে কোনও বাক্সেই পায়রা রাখা চলে না।"

"তাহলে ভুলটা হল কোথায় ?"

"ভুল হল এই যে তিনি ভেবেছিলেন, ছিদাম এ ব্যাপারে যুক্তি ব্যবহার করবে। ছিদাম পায়রার বাক্স বেছেছিল সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে। সেইখানেই হল মুশকিল !"

"ঠিক ধরেছ তুমি। আমি একদম চিন্তা করিনি যে ব্যাটা কলেজ ফাঁকি দিয়েছে লজিক জানবে কোত্থেকে ?" তাকিয়ে দেখি কখন জানি প্রফেসর ফেনী আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভদ্রলোকের অপ্রস্তুতভাবটা অনেকটা কেটে গেছে। এমন কি একটু যেন উৎফুল্লই লাগছে। বোধহয় ছোড়দার সব কথাগুলো কানে গেছে। গুনীরা আবার উপযুক্ত সমজদার দেখতে পেলে খুশী হয়ে যান কিনা !

"তোমরা কারা বাপু, আগে তো দেখি নি তোমাদের ?"

"আমরা এখানকার লোক নই, বাইরে থেকে আসছি।" ছোড়দা উত্তর করল।

"বেড়াতে এসেছো ?"

"ঠিক বেড়াতে নয়, রাজপুরীতে আমাদের একটু কাজ আছে।"

"সেতো তিন মাইল দূরে, এখানে কি করছ ?"

"আসলে আমরা ঠিক জানি না রাজবাড়িটা কোথায়, খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এসেছি।"

"তা চিন্তার কিছু নেই। লাট্টুরামের টমটম আছে, ওকে বললেই তোমাদের পৌঁছে দেবে।"

"তাকে কোথায় পাওয়া যাবে ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। মনে হল পা-টাও যেন একটু টন্‌টন্ করছে।

"সেটাই হচ্ছে মুশকিল, ছোকরার দেখা পাওয়াটা ভারি শক্ত।"
"তাহলে কি করা যায় ?"
"একটা কাজ করা যেতে পারে। আমরা এখান থেকে সোজা চিন্তামণির চায়ের দোকানে চলে যেতে পারি। লাটুরামের খুব চায়ের নেশা। ওখানে গেলে হয়ত ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।"
"কিন্তু সে যদি অন্য কোথাও গিয়ে চা খায় ?" আমি প্রশ্ন তুললাম।
"অবশ্যই সম্ভব, কিন্তু আমরা তো ধাঁধাপুরীর সবকটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসে থাকতে পারিনা। চিন্তামণির দোকানে না গিয়ে সে কালু বসাকের স্টলেও যেতে পারে, অথবা অন্নভান্ডারে। আমজাদ আলীর দোকানে যাওয়াটাও অসম্ভব নয়, সেখানে আবার তোফা মাট্‌ন রোল পাওয়া যায় কিনা !" জিবটা একবার চেটে নিলেন প্রফেসর ফেনী। আমরা ইতঃস্তত করছি দেখে তিনি বললেন, "একটা কথা খাঁটি, এখানে সে কখনোই আসবে না। আচ্ছা, তোমরা যাও বা না যাও, আমি চললাম। বড্ড খিদে পেয়েছে। আমার," বলে তিনি যাবার উপক্রম করলেন।
"খিদে আমাদেরও পেয়েছে," কাঁচুমাচু মুখে ছোড়দা বলল, "কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমার পকেটে রয়েছে মাত্র একটাকা। তোর কাছে কত আছে রে বুবু ?"
আমি জিন্‌স্-এর পকেটগুলো হাতড়ে হাতড়েও পঞ্চাশ পয়সার বেশি বার করতে পারলাম না।
"ওই যাঃ, ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে, আমার পকেটও তো ভোঁ ভাঁ। ছিদামব্যাটা সর্বস্বান্ত করেছে।" প্রফেসর ফেনী চোখ দুটো আধাবুজে বোধহয় কি করা যায় ভাবতে লাগলেন। খাবারের কথা উঠতে আমর তো পেট চোঁ চোঁ করতে শুরু করেছে। ছোড়দা বেচারা কলেজ থেকে এসে কিছু খেতে পায়নি, তার আগেই ওকে পাকড়ে এনেছি। ওর পেটেও নিশ্চয় ছুঁচোর কেত্তন !
"এখানে মনে হচ্ছে গুরুতর কিছু আলোচনা চলছে।" নতুন গলা শুনে চমকে তাকিয়ে দেখি পাঁচ ফুট লম্বা টিংটিং-এ একটা ছেলে, থুতনিতে ছাগলের মত একটু দাঁড়ি, গায়ে কলার লাগান স্পোর্টস্ গেঞ্জী, জিন্‌স্-এর প্যান্ট আর হাওয়াই চপ্পল পরে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে গা-জ্বালান একটা ফিচ্‌কে

হাসি।

"আরে হলধর সাঁপুই যে!" প্রফেসর ফেনী সমস্যার সমাধান পেয়েছেন মত মুখ করলেন।

"নমস্কার মাস্টার মশাই, কিসের মীমাংসা করছেন এখানে দাঁড়িয়ে?"
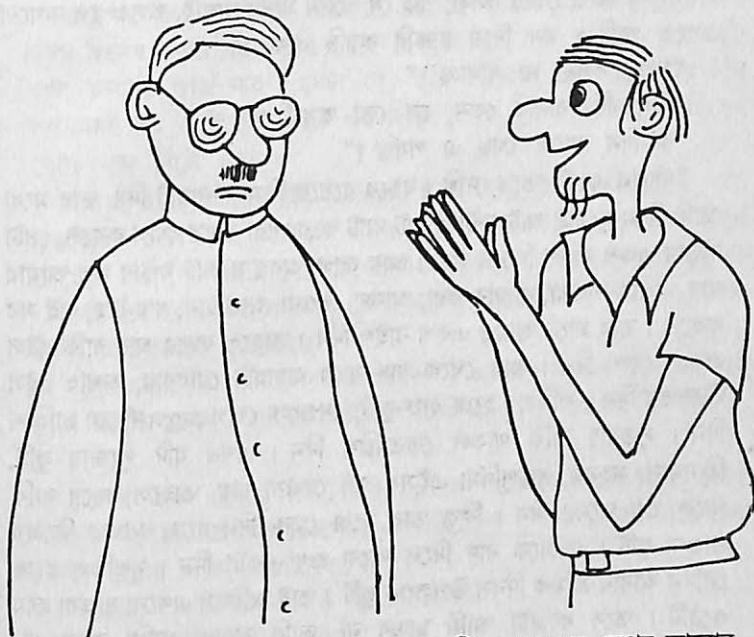
"মীমাংসা টিমাংসা কিছু নয়। সবার খুব খিদে পেয়েছে, অথচ কারোর কাছেই পয়সা নেই। তাই সমস্যায় পড়েছি।"

"এটা আবার সমস্যা হল নাকি, খেতে কি পয়সা লাগে?" কথাটা বলেই বিচ্ছিরি একটা খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দ করে হাসতে সুরু করল হলধর সাঁপুই। হাসিটা আর থামছেই না। তাহলে হয়তো খাবার একটু আশা আছে! প্রশ্ন করলাম, "সে কি কথা, খেতে পয়সা লাগে না এদেশে?"

হলধর সাঁপুই বেশ খানিকটা বিষম টিষম খেয়ে হাসি থামিয়ে বলল, "লাগে, তবে বোকাদের।" বলেই আড়চোখে প্রফেসর ফেনীর দিকে তাকিয়ে

যোগ করল, "আর যাঁরা কলেজে টলেজে পড়ান, গোবেচারা, মানে সাধু গোছের লোক, তাঁদের।"

প্রফেসর ফেনী দুঃখিত স্বরে বললেন, "সে কি হলধর, আবার তুমি লোক ঠকাতে শুরু করেছ ? এই যে সেদিন বললে চাকরি নিয়ে সৎপথে চলবে !"

হলধর জিভ কেটে বলল, "কি যে বলেন মাস্টারমশাই, অসৎপথে কখনো চলতে পারি ? মন দিয়ে চাকরি করছি এখন।"

"সত্যি বলছ, না বানাচ্ছ ?"

"ছি-ছি-ছি, বানাব কেন, সে তো অধর্ম হবে !"

"ক'-দিন কাজে গেছ এ পর্যন্ত ?"

"দাঁড়ান একটু ভেবে দেখি। বছরে রয়েছে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন, তার মধ্যে আমি দিনে ঘুমোই আট ঘণ্টা। আট আট করে সারা বছরে যোগ করলে, সেটা দাঁড়ায় একশ বাইশ দিনের মত। আর জাগা অবস্থায় আট ঘণ্টার মত আমার যায় খাওয়া-দাওয়া, বাজার করা, আড্ডা দেওয়া, স্নান-টান, ধম্ম-টম্ম, এই সব করতে। তার মানে আরও একশ বাইশ দিন। তাহলে বছরে আর বাকি রইল একশ একুশ দিন। তার থেকে বাদ যাবে বাহান্নটা রোববার, অর্থাৎ রইল উনসত্তর দিন। শনিবার হচ্ছে হাফ-ছুটি, সেগুলো যোগ করলে দাঁড়ায় ছাব্বিশ দিন। সুতরাং বাকি থাকল তেতাল্লিশ দিন। এখন যদি পুজোর ছুটি, ক্রিসমাস, মহরম, বুদ্ধপূর্ণিমা এইসব বাদ দেওয়া যায়, তাহলে বছরে বাকি থাকে শুধু পনের দিন। কিন্তু তার মধ্যে চোদ্দ দিন হচ্ছে আমার নিজের পাওনা ছুটি। সেটাকে বাদ দিলে থাকে শুধু একটা দিন। মুশকিল হচ্ছে সেদিন আবার শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ছুটি। তাই অফিসে এখনো যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে কাজটা আমি ছাড়ব না, ভারি আনন্দ পাচ্ছি কাজে।"

আমি বললাম, "সেটা কি করে সম্ভব ?"

"কোনটা কি করে সম্ভব ?"

"কাজ না করে কি ভাবে কাজে আনন্দ পাওয়া যায় ?"

"অত্যন্ত সোজা। ধর তোমাকে বলা হল, তোমার কাজ হচ্ছে প্রতিদিন দশ মণ মাটি বওয়া। কাজটা খুব খাটনীর, কিন্তু তবু তুমি করবে বলে রেডি হয়ে আছ। তখন তোমাকে বলা হল, যদিও ওই কাজটা তোমার, কিন্তু আপাততঃ ওটা তোমায় করতে হবে না। পয়সা-টয়সা অবশ্য ঠিকমতই পাবে। তাহলে তোমার আনন্দ হবে না ?"

" তা হয়ত হবে।"

"তুমি কি কাজটা করেছ ?"

"না।"

"ব্যাস, কিউ· ই· ডি·, অর্থাৎ ইহাই উপপাদ্যের বিষয়।"

প্রফেসর ফেনী বললেন, "হলধর তোমার যুক্তিগুলো ভারি ফোঁপরা। সময় হিসেব করার সময় তুমি ধরেছ যে তুমি আট ঘণ্টা ঘুমোও, আর আট ঘণ্টা অন্যান্য কাজ কর। সেটা তো তুমি শনিবার, রবিবার, ছুটির দিন সবসময়ই কর। তাহলে আবার ওই দিনগুলোকে পুরোপুরি কাজের হিসেব থেকে বাদ দিলে কেন ?"

"আ-হা-হা, মাস্টারমশাই, ওগুলো হচ্ছে সূক্ষ্মবিচার। সংসারে অত সূক্ষ্মবিচার চলে না। যাক্‌গে ওসব কথা। আসলে আপনাদের খিদে পেয়েছে। তা খিদে যখন পেয়েছে, তখন চিন্তামণির দোকানে গেলেই হয় ?"

"তা তো হয়। কিন্তু বললাম যে আমাদের পকেটে কিচ্ছু নেই," প্রফেসর ফেণী নিরাশভাবে বললেন।

" সে ভাবনা আমার, "হলধর আশা দিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বলল, "মাস্টারমশাইয়ের জন্য এটুকু না করলে কি চলে !"

মেলার এক কোনে চিনতামণির চায়ের দোকান। দোকানে লোক গীজগীজ করছে। হলধর কোত্থেকে একটা টেবিল জোগাড় করে নিয়ে এল, "ক'টা চেয়ার লাগবে আমাদের ?"

"চারটে, "আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম।

"নাঃ, চারটেতো খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

প্রফেসর ফেনী চিন্তিত ভাবে বললেন, "তাহলে তো মুশকিল !"

"মুশকিল মনে করলেই মুশকিল," বলেই হলধর চেঁচিয়ে উঠল, "আগুন, আগুন !"

"কোথায়, কোথায়" বলতে বলতে দোকানের লোকগুলো হুড়মুড় করে উঠে পড়ি কি মরি বাইরের দিকে ছুটল। হলধর চটপট চারটে চেয়ার আমাদের টেবিলের কাছে টেনে এনে বলল, "তাড়াতাড়ি বসে পড়া যাক, নইলে আবার হাতছাড়া হয়ে যাবে।"

"ছি-ছি হলধর, ডাহা মিথ্যেকথা বললে তুমি !" প্রফেসর ফেনী ধমকের সুরে বললেন। অবশ্য চেয়ারে বসে।

"মিথ্যে হবে কেন ? আগুনতো জ্বলছেই। তবে বাইরে নয়, আমার পেটে—খিদের আগুন।"

"কিন্তু লোকগুলো তো ভাবল দোকানে আগুন লেগেছে।"

"আমি তার কি করতে পারি মাস্টারমশাই ?" দুঃখ দুঃখ মুখ করল হলধর সাঁপুই, "বিশ্বের সব্বার ভুল তো আমি শোধরাতে পারি না।"

হলধরটা যে মহা বজ্জাত বুঝতে আমার এতটুকু অসুবিধা হল না। বিশ্ব ঠকিয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তার জন্য এতটুকু অনুতাপও নেই।

"কি খাবেন মাস্টামশাই, খাস্তাকচুরি ?"

"না হে হলধর, বড্ড অন্যায় করেছ তুমি। এ অবস্থায় আমার পক্ষে খাওয়াটা খুব অনুচিত হবে "

"বেশ স্যার, মানছি আমি অন্যায় করেছি। আর তার জন্য হাতজোড় করে আমার মাস্টারমশাইয়ের কাছে ক্ষমা চাইছি।"

হলধর সাঁপুই হাতজোড় করে ঘাড়টাকে এ্যাইসা নুইয়ে ফেলল যে কি বলব !

"এবার বলুন স্যার কি খাবেন ?"

এরপর আর প্রফেসর ফেনী কি করতে পারেন !

"তোমরা কি খাবে ?" প্রফেসর ফেনী আমাদের দিকে তাকালেন।

"কচুরি, কচুরিই চলুক।" আমরা দুজনেই প্রায় একসঙ্গে বললাম।

"বেশ, সবাই আমরা খাস্তাকচুরি খাব তাহলে।" প্রফেসর ফেণী জানালেন।

"আমি অর্ডার দেব মাস্টারমশাই। অর্ডারের সময়ে কিন্তু আপনি কোনও কথা বলবেন না।" হলধর প্রফেসর ফেনীকে সাবধান করে দিল।

"বাপু হলধর, মনে রেখো আমাদের কাছে পয়সাকড়ি কিচ্ছু নেই," প্রফেসর ফেনী ওকে আবার মনে করিয়ে দিলেন।

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মাস্টারমশাই, সে ভাবনা আমার।"

হলধরের কথা শেষ হতে না হতেই গামছা কাঁধে, খালি গায়ে, খোঁচা খোঁচা চুল-দাড়িঅলা একটা লোক হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, "অর্ডার দিন, অর্ডার দিন।"
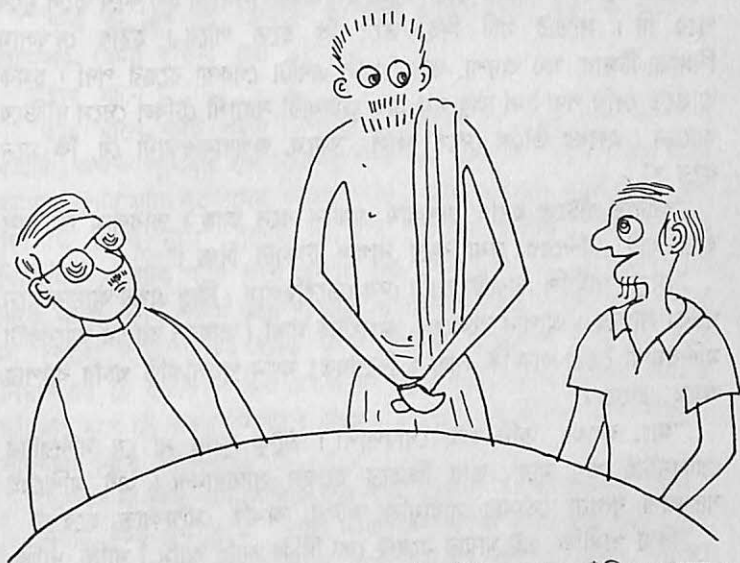
"চারজনের জন্য ডিমভাজা আর পাউরুটি," হলধর চেঁচিয়ে বলল। আমরা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি, তার আগেই লোকটা যেমন ধূমকেতুর মত এসেছিল, তেমনি আবার অদৃশ্য হল।

প্রফেসর ফেনী বললেন, "এটা কি করলে ? সবাই বললাম 'কচুরি', আর তুমি কিনা বলে দিলে ডিমভাজা !"

"ও তাই বুঝি, বড্ড ভুল হয়ে গেল তো ! দাঁড়ান এক্ষুণি শুধরে নিচ্ছি," বলেই হলধর গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাল, "নিমাই, ওরে ও নিমাই।"

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আবার খোঁচা খোঁচা দাঁড়িঅলা নিমাইয়ের আবির্ভাব হল।

"নিমাই, ডিমভাজা আর রুটির বদলে খাস্তাকচুরি নিয়ে এস আমাদের জন্য। বুঝলি তো খাস্তাকচুরি, ডিমভাজা আর রুটির বদলে।"

নিমাই ঘাড় নেড়ে চলে গেল। খাবারের গন্ধে সারা জায়গাটা ম ম করছে। এই অবস্থায় জিভের জলটা সামলে রাখাই মুশকিল। পাশের টেবিলে আবার এক বুড়ো মত ভদ্রলোক এক প্লেট সিঙ্গাড়া সস দিয়ে তারিয়ে

তারিয়ে খাচ্ছেন। আমার ভীষণ ইচ্ছে হল একটা সিঙ্গাড়া টপ করে তুলে মুখে পুরে দি। সত্যিই যদি দিই, তবে কি হতে পারে! হঠাৎ দেখলাম সিঙ্গাড়া-টিঙ্গারা সব অদৃশ্য, তার বদলে একটা গেরুয়া রঙের পর্দা। চমক ভাঙতে দেখি পর্দা-টর্দা কিছু নয়, এক জটাধারী সন্ন্যাসী টেবিল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছেন। হলধর তাঁকে দেখে বলল, "আরে, জগদানন্দস্বামী যে, কি মনে করে?"

"হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখলাম এখানে বসে আছ। ভাবলাম জিজ্ঞেস করে যাই, মন্দিরের জন্য কবে নাগাদ টাকাটা দিচ্ছ।"

"দেখুন স্বামীজি, টাকাটা আমি দেব ভেবেছিলাম ; কিন্তু এখন আমার মনে খটকা লাগছে। আপনি বলেছেন, জগৎটাই মায়া। তাহলে আবার আরেকটা মন্দিরমায়া তৈরী করে কি লাভ? বিশেষতঃ যখন পয়সাকড়ি খর্চার ব্যাপার আছে তাতে।"

"আঃ, হলধর, তুমি হচ্ছ ঘোরপাপী। এটুকু বুঝছ না যে মন্দিরটার খোলসটাই শুধু মায়া, তার ভিতরে হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ। এই মন্দিরেই সদগুরুর কৃপায় তোমার মায়ামুক্তি ঘটবে, অর্থাৎ মোক্ষলাভ হবে।"

"কিন্তু স্বামীজি, এই মায়ার মধ্যেই তো দিব্বি আছি আমি। খাচ্ছি, দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি—এটাই তো আমার মোক্ষ।"

"একে তুমি মোক্ষ বল!" ঘেন্নায় মুখটা বিকৃত করলেন স্বামীজি, "দুর্নীতি, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, খুনোখুনী, কি নেই এদেশে?" উত্তেজনায় গলা চড়ছে স্বামীজি, "আর সুখের কথা বলছ, সে তো ক্ষণস্থায়ী। দুদিন বাদে বুড়ো হবে, অথর্ব হবে, পাপের ফল ভোগ করতে করতে তিলে তিলে মারা যাবে।"

"ওসব যাই বলুন স্বামীজি, আমার কছে মন্দির মানেই একদল পেটমোটা পুরুত। অন্যের পয়সায় ফোকটে ফূর্তি মারছে।"

"নাঃ, হলধর, তোমার মাথায় আজ কুবুদ্ধি ভর করেছে। বোঝার চেষ্টা কর যে রোগা-মোটা-টাকা-পয়সা সবকিছু অর্থহীন। সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, কোনও কিছুই চিরদিনের জন্য থাকবে না। তোমাব কাছে যা বাস্তব সত্য মনে হচ্ছে, সেটা সম্পূর্ণ অসত্য। এ পৃথিবীতে কোনও কিছুই সত্যি নয়।" স্বামীজির মুখে তখন দিব্যজ্যোতির আভাস।

"কোনও কিছুই সত্যি নয়?" এবার প্রফেসর ফেনী জিজ্ঞেস করলেন।

"কোনও কিছুই নয়," প্রফেসর ফেনীর কৌতূহল জাগাতে পেরে স্বামীজির

প্রসন্ন বদন।

"কিন্তু তা যদি হয়, তাহলে আপনার কথাটা সত্যি হয় কি করে ?" প্রফেসর ফেনী যুক্তির প্রশ্ন তুললেন।

"তার মানে ?"

"তার মানে খুবই সহজ। পৃথিবীর অন্যান্য সবকিছুর মত, আপনার কথাটা, অর্থাৎ 'পৃথিবীর কোনও কিছু সত্যি নয়' কথাটাও মিথ্যা। তার মানে আমার পেটমোটা পুরুতদের কথাটা সত্যি, আর মন্দিরের জন্য আমি এক পয়সাও দিচ্ছি না।" বলেই মিটমিটে শয়তান হলধরটা আগের মত বিচ্ছিরিভাবে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে শুরু করল। স্বামীজি চোখটোখ লাল করে, রাগে ফোঁস ফোঁস করে কিছুক্ষণ ফুললেন। কিন্তু জুৎসই কিছু বলতে না পেরে, দাঁড়িগোঁফের ফাঁক দিয়ে অনেক অভিশাপ টভিশাপ দিয়ে নিমাইয়ের ট্রে থেকে টপাটপ কতগুলো কচুরি তুলে অদৃশ্য হলেন। নিমাই কাঁচুমাঁচু মুখে ট্রে নাবাতে নাবাতে বলল, "কতগুলো কচুরি কম হল হলধরদা, সাধুবাবা নিয়ে নিলেন।"

"ভাবিস না কিছু, ওটা মন্দিরে দান করে দিলাম," দানবীর হলধর বলল।

নিমাই কিছু বুঝতে না পেরে, একটুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে চলে গেল। এতক্ষণবাদে খাবার পেয়ে আমরা সবাই খাবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আর ওঃ! কি ভালো যে কি বলব! যেমন স্বাদ, তেমনি তার খোশবাই! বর্ণনা অসম্ভব! একটা কথাও না বলে, আমরা গপগপ খেয়ে চললাম। খাওয়া-দাওয়া যখন শেষ হয়েছে, তখন নিমাই এল পয়সা নিতে। "হলধরদা, পয়সা ?"

"কিসের পয়সা ?" হলধরের চোখ কপালে উঠল।

"কচুরির !"

"সে কি রে, কচুরি তো ডিমভাজা আর রুটির বদলে নিয়েছি। মনে নেই ?"

নিমাই কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে মাথাটাথা চুলকে বলল, "বেশ, তাহলে ডিমভাজা আর রুটির জন্যই পয়সা দিন।"

"ভারি উজবুক তো তুই। ডিমভাজা আর রুটি তো আমরা খাই-ই নি। যা খাইনি, তার জন্য পয়সা দেব কেন ?"

নিমাই হলধরের কথা শুনে ভড়কে গিয়ে, "চিন্তামণিবাবু, চিন্তামণিবাবু, হলধরদা পয়সা দিচ্ছেন না," বলে চিৎকার করতে লাগল। চেঁচামেঁচির ফলে চারিদিকে কেমনজানি গুঁতোগুঁতি শুরু হল, আর এই ফাঁকে হলধর হঠাৎ টেবিলটা উল্টে দিয়ে অদৃশ্য হল। আমিও ধাক্কা খেতে খেতে ঝোলাকাধেঁ একটা লোকের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়লাম। ধাক্কা খেয়ে লোকটা প্রথমে এক পায়ে বাঁই বাঁই করে লাট্টুর মত অনেকক্ষণ ঘুরে নিল। তারপর একগাল হেসে বলল, "আমি লাট্টু সিং। তোমার নাম কি খুকি ?"

॥ চার ॥

এ রকমভাবে লাট্টু সিং-এর দর্শন পেয়ে যাব কল্পনা করিনি। ছেলেটার মুখটা হাসিহাসি, হাফ হাত ফতুয়া ভুঁড়ি পর্যন্ত নামেনি। মুখে দাড়ি গোঁফের চিহ্নমাত্র নেই, মাথার ঠিক মাঝখানে কয়েকগাছা চুল। ভুঁড়ির নিচে একটা হাফপ্যান্ট কষে বেল্ট দিয়ে বাঁধা। কিন্তু ছোড়দা আর প্রফেসর ফেনী কোথায়

গেল ? চারিদিকে তাকিয়ে দেখি অল্পকিছুক্ষণের মধ্যেই লোকের সংখ্যা যেন বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। চিন্তামণির খাবার দোকানের সামনে এখন বিরাট লাইন। আশেপাশের দোকানগুলোতেও লোক থিক থিক করছে। দোকানগুলো ছেড়ে মাঠের মাঝখানে চোখ ফেরালাম। একদল লোক মাঠে ছোট ছোট সতরঞ্জী বিছিয়ে তাসতাবা নিয়ে বসে গেছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা তাদের পাশ কাটিয়ে ছুটোছুটি করে খেলছে। দূরে এক জায়গায় অনেক বেলুন ওড়ান হচ্ছে। হঠাৎ যেন সেখানে প্রফেসর ফেনীকে দেখলাম। লোকটা মুখ ঘোরাতে বুঝলাম অন্য কেউ।

"কি খুঁজছ ?" লাট্টু প্রশ্ন করল।

"আমার ছোড়দাকে।"

"কত বড় ?"

"সতেরো বছর ?"

"আরে তা নয়, মানে সাইজটা কত, দু-আঙুল, দু-বিঘৎ, দু-হাত, দু-গজ,... ।"

লাট্টুর বুদ্ধি দেখে আমি অবাক হলাম। "ছোড়দা হচ্ছে একটা ছেলে। ওর সাইজ হচ্ছে, অ্যাভারেজ সাতেরো বছরের ছেলের মত, পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি।"

"ওঃ, তাহলে তো খুঁজে পাওগা মুশকিল, অনেক মানুষ এখানে !"

ছেলেটার সঙ্গে কথাবলা অর্থহীন। আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, যদি হঠাৎ নজরে পড়ে যায় !

"তুমি হারিয়ে গেছ, না তোমার ছোড়দা হারিয়ে গেছে," লাট্টু প্রশ্ন করল।

"কেন দুটোর মধ্যে কোনও তফাৎ আছে নাকি ?"

"বারে, তফাৎ নেই ? তুমি যদি হারিয়ে গিয়ে থাক, তাহলে একদম চুপচাপ বসে থাক। একসময়ে না একসময়ে তোমার ছোড়দা খুঁজতে খুঁজতে ঠিক এখানে এসে হাজির হবে। আর তোমার ছোড়দা যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তোমার এক্ষুনি খুঁজতে শুরু করা উচিত।" খুব বিজ্ঞের মত লাট্টু বলল।

"কেন দুজনে দুজনকে খুঁজলে কি ক্ষতি ?" আমার কথার হুলটা লাট্টু ধরতে পারল না।

“ক্ষতি অনেক। ধর তুমি আছ ‘ক’ বিন্দুতে, আর তোমার ছোড়দা ‘খ’ বিন্দুতে। তোমার ছোড়দা যখন তোমায় খুঁজতে ‘ক’ বিন্দুতে এল, তুমি তখন ছোড়দাকে খুঁজতে ‘গ’ বিন্দুতে চলে গেছ। আবার ছোড়দা যখন ‘গ’ বিন্দুতে পৌঁছল, তুমি তখন ‘ঘ’ বিন্দুতে সরে গেছ। এরকম করলে কখনোই তোমাদের দেখা হবে না। আর তুমি যদি দৌড়োদৌড়ি না করে ‘ক’ বিন্দুতেই বসে থাকতে, তাহলে চটপট দেখা হয়ে যেত।”

কথাগুলো এত বোকাবোকা যে চুপ করে থাকা কঠিন। “কেন এমনও হতে পারে যে আমি ছোড়দাকে খুঁজতে খুঁজতে ‘গ’ বিন্দুতে গেলাম, আর ছোড়দাও আমাকে খুঁজতে খুঁজতে ‘গ’ বিন্দুতেই এল। তাহলে?”

লাট্টু মাথা নেড়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করল, “কথাটা অযৌক্তিক নয়, বলতে গেলে খুবই যুক্তিযুক্ত। ইস্‌স্‌ আমি কেন এটা ভাবলাম না।” বলেই ঠাসঠাস নিজের দু’গালে দু’টো চড় কশাল। এখানকার লোকেরা আচ্ছা পাগল তো!

“আসলে বিকেল হলেই বুদ্ধির তেজটা আমার কমে যায়।” লাট্টু ঝোলা থেকে দুটো কালো মতন বড়ি বার করে, মুখে দিয়ে কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে ফেলল। জিজ্ঞেস করলাম, “ওটা কি?”

“বুদ্ধিবটিকা। মাথাটা একেবারে পরিষ্কার করে দেয়। হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি।” লাট্টু কিছুক্ষণ চুপ মেরে বসে রইল। তারপর বলল, “যাক, বুদ্ধিটা আবার ধারালো হয়ে উঠেছে। এবার এসো, তোমার বুদ্ধিটাকে একটু বাজিয়ে দেখি।” এরকম একটা লোকের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই করতে কার ভাল লাগে? “আমার তাড়া আছে,” আমি বললাম।

“কিসের তাড়া?”

বললাম যে ছোড়দাকে খুঁজে বার করতে হবে, তারপর যেতে হবে রাজপুরীতে। একদম কোনও সময় নেই কথা বলার। লাট্টু আমার কথা কানেই তুলল না। “ভারি তাড়া তোমার! তোমার ছোড়দাও ফিরে আসবে, আর রাজপুরীও টিঁকে থাকবে। ওসব কোনও চিন্তারই বিষয় নয়। চিন্তার বিষয় হল, তুমি নাকি আজকাল আর বিড়ি খাচ্ছ না?”

আমি বললাম, “ধ্যাৎ।”

“‘ধ্যাৎ’ নয়, ‘হ্যাঁ’ কি ‘না’।”

“হ্যাঁ।”

"তার মানে এ্যাদ্দিন তুমি বিড়ি খেতে ?"

"কখন বললাম সে কথা ?"

"বাঃ, এই যে তুমি বললে, আজকাল বিড়ি খাওয়া বন্ধ করেছ। তারমানে আগে নিশ্চয় খেতে।"

"কি বিপদ! আমি আসলে বলতে চেয়েছিলাম, 'না'।"

"ও, তার মানে তুমি এখনও বিড়ি খাও!"

"দুত্তেরি! আমি বলতে চাচ্ছিলাম, আমি কখনো বিড়ি খাইনি।"

"তাহলে বললে না কেন ?"

আমি রাগকরে বললাম, "বেশ করেছি।"

"আ-হা-হা রাগ কর কেন। আচ্ছা এবার সহজ প্রশ্ন করছি।" এই বলে মুচকি হেসে ঝোলা থেকে একটা বই বার করে আমার হাতে দিল। "বইয়ের আট নম্বর পাতাটা খোলতো।"

"আঃ, বললাম যে আমার সময় নেই, ছোড়দাকে খুঁজে বার করতে হবে।"

আমার তীব্র অনিচ্ছা দেখে লাট্টু চোখ বুজে কি জানি ভাবল। তারপর পকেট হাতড়ে একটা সেফটিপিন বার করে চোখ নাক কুঁচকে কিছুক্ষণ কান খুঁটল। খোঁটা বন্ধ করে একটু ভুঁড়ি চুলকোল। তারপর বলল, "তুমি ভাবিত হয়েছে, তোমাকে সাহায্য করা উচিত।"

আমি কিছু না বলে ওর দিকে তাকালাম।

"কিন্তু বিনিপয়সায় এদেশে কিচ্ছু হবার জো নেই। তোমায় অবশ্য পয়সা দিতে হবে না। তার বদলে কিছু প্রশ্নের উত্তর দাও।"

লাট্টুর কথাবার্তার ধরন আর বুদ্ধির বহর দেখে আমার আদৌ কোনও ভরসা হচ্ছিল না। বললাম, "তুমি কি সাহায্য করবে, তুমি তো ছোড়দাকে চেনই না ?"

"আমি এখানকার সব্বাইকে চিনি।"

"মোটেই না। তুমি আমাকেও চেন না, ছোড়দাকেও চেন না।"

"নিশ্চয় চিনি। এই মেলায় শুধু তোমাদের দুজনকে আমি চিনতাম না। এখন তোমাকে আমি চিনি, বাকি রইল তোমার ছোড়দা। তার মানে এই মেলায় যাকে আমি চিনতে পারব না, সেই হচ্ছে তোমার ছোড়দা। তার মানে আমি তোমার ছোড়দাকেও চিনি।"

"কিন্তু এতগুলো লোকের মধ্যে খুঁজে পাবে কি করে ?"

“ঘাবড়াও মৎ, সব দোকানে দোকানে গিয়ে খবর দিয়ে দেব। তাদের কেউ না কেউ ঠিক বার করে ফেলবে। কিন্তু সেসব পরকা কথা, আগে এই বইটার আট নম্বর পাতা খোল।”

অনিচ্ছা সত্ত্বও আট নম্বর পাতাটা খুলে দেখি সেখানে লেখা :
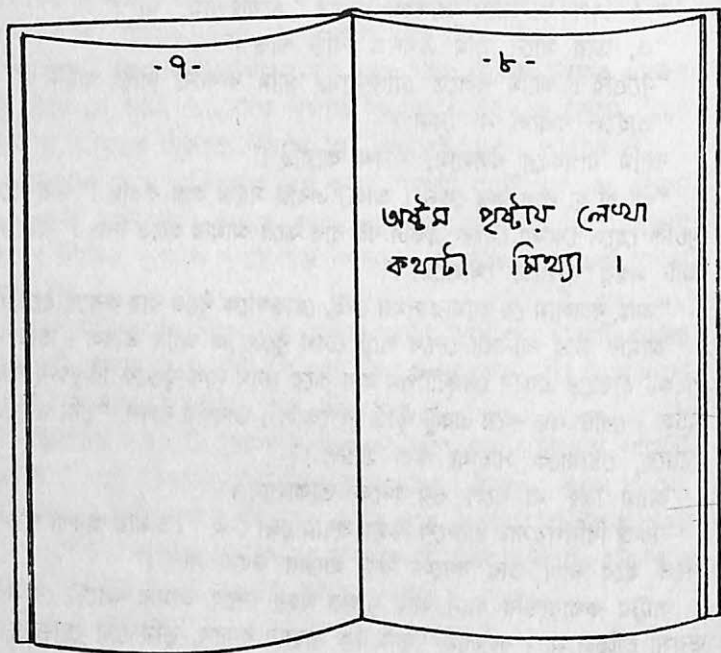
“এইবার বলতো খুকি…।”

আমি বাধা দিয়ে বললাম, “‘খুকি’ নই, আমি বুবু।”

“বেশ, বুবু। বলতো বুবু আট নম্বর পাতার লেখাটা সত্যি না মিথ্যা।”

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, ওটাও মাঠে পাওয়া কাগজগুলোর মত, ভারি গোলমেলে। কিন্তু এই নিয়ে এখন মাথা ঘামাতে এতটুকু ইচ্ছে করছিল না। বললাম, “দুটোই হতে পারে।” লাট্টু মাথা নেড়ে বলল, “উঁহু, ভুল হল,

কোনোটাই হতে পারে না।"

নিশ্চয় ছেলেটা বাজে বকছে! "কেন যদি ধরি কথাটা সত্যি?"

"তাহলে কথার বক্তব্য অনুসারে, কথাটা মিথ্যা। একই কথা সত্যি আর মিথ্যা, দুটোই হতে পারে না। অতএব তোমার অনুমানটা ভুল। অর্থাৎ কথাটা সত্যি হতে পারে না। পারে কি?" বলেই লাট্টু মহা ফূর্তিতে বন্‌বন্‌ করে দু'পাক ঘুরে নিল।

এমন আর্গুমেন্ট লাট্টুর কাছ থেকে আশা করিনি। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল ও একটা পুরোপুরি আবোলতাবোল।

"বেশ, যদি ধরতাম কথাটা মিথ্যা। তাহলে?"

"তার মানে, 'অষ্টম পৃষ্ঠায় লেখা কথাটা মিথ্যা'—এটা সত্যি নয়। কিন্তু সেটাই তো কথাটার বক্তব্য! অতএব তোমার অনুমানটা আবার ভুল, কথাটা মোটেই মিথ্যা নয়।" আবার বাঁই বাঁই করে ঘুরপাক!

"তার মানে তো কথাটা সত্যি-মিথ্যা কোনওটাই নয়!"

"এইবার ঠিক বুঝেছ। সেইজন্য তুমি যখন বললে, দুটোই হতে পারে; আমি বললাম, কোনোটাই নয়।"

"ঠিক এরকম একটা গোলমেলে কথা কিছুক্ষণ আগেই একটা বুড়ো আমাকে বলেছিল।"

"কি কথা?"

"গল্পটা ছিল: মন্ডলপুরের মোড়ল বলেছে যে মন্ডলপুরের সবাই হচ্ছে মিথ্যুক। এখন মোড়ল যদি সত্যি বলে থাকে, তাহলে সে মিথ্যে বলছে; কারণ সে নিজেও মন্ডলপুরের লোক। আবার সে যদি মিথ্যে বলে থাকে, তার মানে মন্ডলপুরের সবাই সত্যিকথা বলে; অতএব সেও সত্যি কথা বলছে।"

লাট্টু একটু ভুঁড়ি চুলকে বলল, "নাঃ, এটা কিন্তু ঠিক বিচার হল না।"

আমি বললাম,, "কেন?"

"প্রথমে চিন্তা কর, মিথ্যুক মানে কি। যে সবসময় মিথ্যে কথা বলে, না প্রায়ই মিথ্যে কথা বলে।"

"কেউ যদি প্রায়ই মিথ্যে কথা বলে, তাকেও আমি মিথ্যুক বলব।"

"ব্যাস, তাহলেই দেখ এটা আর সমস্যা রইল না। মোড়লের কথাটা

নিশ্চয় সত্যি হতে পারে যে মন্ডলপুরের লোকেরা প্রায়ই মিথ্যে কথা বলে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তার ওই কথাটা মিথ্যা।"

লাট্টুর কথাগুলো এত পরিষ্কার আর ঝরঝরে যে বুঝতে আমার এতটুকু অসুবিধা হল না। "অবশ্য যদি ধরতাম মিথ্যুক মানে যারা সবসময়ই মিথ্যে কথা বলে, তাহলে এটা বেশ গোলমেলে সমস্যা হত, তাই না ?"

"ঠিক ধরেছো," লাট্টু সন্তুষ্ট হল, "কিন্তু এসব আলোচনার কোনও অর্থ হয় না, কারণ আমি জানি মণ্ডলপুরের লোকরা সবাই মিথ্যুক নয়, সেখানে দু'ধরনের লোক আছে।"

"মানে ! তুমি মন্ডলপুর চিনলে কি করে ? আমি তো এতক্ষণ এটা একটা বানান গল্প ভাবছিলাম !"

"চিনব না ! কতবার সেখানে গেছি। আমারখুড়তোতো ভাইয়ের বউ-এর মাসতোতো বোনের ননদ থাকে ওখানে। এত আপনজন ! আর খাওয়াতে বড্ড ভালোবাসে ! মাঝে মাঝে না গেলে রাগ করে। যাক্ যা বলছিলাম। মন্ডলপুরে দু' ধরনের লোক আছে।"

"কি রকম ?"

"একদল হচ্ছে সত্যবাদী, তারা সবসময় সত্যিকথা বলে। আরেকদল হচ্ছে, মিথ্যাবাদী, তারা সবসময় মিথ্যে কথা বলে।"

"এরকম হওয়া আবার সম্ভব নাকি ?"

"কেন নয় ?"

"আমরা তো কখনোই সবসময় সত্যি বা মিথ্যা বলি না।"

"কিন্তু তোমরা তো আর মন্ডলপুরের লোক নও।"

"তা অবশ্য ঠিক।" লোকটা খ্যাপা হলে কি হয়, কথায় সেয়ানা।

"যাক যা বলছিলাম," লাট্টু আবার শুরু করল, "আমার বেশ মনে আছে, একবার সেখানে গিয়ে খুব বিপদে পড়েছিলাম। পথ হারিয়ে ফেলেছি ; আর যাকেই পথ জিজ্ঞেস করছি, আমার কপালগুণে সে ব্যাটাই হচ্ছে মিথ্যেবাদী। তার ফলে রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চরকি কাটছি। হঠাৎ নজরে পড়ল দুটো লোক রাস্তা দিয়ে আসছে। আমি তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, ওহে তুমি সত্যবাদী, না মিথ্যেবাদী ? সে বিড়বিড় করে কি বলল কে জানে। বলেই এমন হনহন করে হাঁটা দিল যে আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগই পেলাম না। তখন আরেকটা যে লোক ছিল, তাকে প্রশ্ন করলাম যে

ও লোকটা কি বলে গেল। সে উত্তর করল, প্রথম লোকটা বলেছে যে সে মিথ্যেবাদী। বোঝ ঠেলা! এবার তুমিই আমায় বল, "লাট্টু প্রশ্ন করল," দ্বিতীয় লোকটা সত্যবাদী, না মিথ্যেবাদী।"

এ আবার কি প্রশ্ন! "দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি একটু ভাবি, "আমি মনে মনে হিসাব শুরু করলাম। প্রথম লোকটা যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে নিশ্চয় নিজেকে বলবে সত্যবাদী। কিন্তু যদি সে মিথ্যেবাদী হয়, তাহলে কি বলবে? মিথ্যেবাদী কখনোই নিজেকে মিথ্যেবাদী বলবে না, বলবে সত্যবাদী। অর্থাৎ, সত্যবাদী বা মিথ্যেবাদী যাই হোক না কেন, প্রথমজন উত্তর দেবে যে সে সত্যবাদী। যেহেতু দ্বিতীয় লোকটি বলেছে যে প্রথমজনের উত্তর ছিল 'মিথ্যেবাদী'। সুতরাং দ্বিতীয় লোকটিই মিথ্যে কথা বলেছে।

বললাম, "দ্বিতীয়জন মিথ্যেবাদী।"

"ভেবেচিন্তে বললে, না আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লে।"

ওর কথার ধরন শুনে আমার পিত্তি চটে গেল। বললাম, "আন্দাজে কেন, আমর কি বুদ্ধি নেই নাকি?"

"আহা চট কেন, এই জিজ্ঞেস করলাম আর কি! আচ্ছা, তারপর কি ঘটল তোমায় বলি। সেটাও একটা অদ্ভুত ঘটনা! এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখি রাস্তার ধারে একটা বিরাট দুর্গ, আর তার সামনের লোহার দরজাটা খোলা। ভাবলাম, নিশ্চয় ওখানে লোকের দেখা পাব। ভাগ্যে থাকলে দু-একটা সত্যবাদীও মিলে যেতে পারে। যেই না দুর্গে ঢুকেছি, সঙ্গে সঙ্গে দুটো পালোয়ান আমাকে পিছমোড়া করে বেঁধে দুর্গের মালিকের কাছে নিয়ে গেল। লোকটার চেহারাটা পাষণ্ডের মত, আর গলা তো নয়, যেন বাজ ডাকছে। আমায় হুমকি দিয়ে বলল, 'তুই নির্ঘাৎ গুপ্তচর, তোর গর্দান নেবো।' আমি তো ভয়ে কেঁদেই ফেললাম। অনেক কাকুতি মিনতি করার পরে লোকটাব বোধহয় একটু দয়া হল। বলল, 'ঠিক আছে, তোকে এখান থেকে পালাবার শুধু একটা সুযোগ দেব। এই দুর্গে দুটো খিরকির দরজা আছে। দরজায় রয়েছে একজন করে পাহারাদার। দুই পাহারাদারই বলে বেড়ায় যে সে সত্যবাদী। কিন্তু আসলে তাদের একজন সত্যবাদী, আরেকজন মিথ্যেবাদী। দুর্গের একটা দরজার ঠিক বাইরেই রয়েছে এক বিরাট খাল, আর সেই খালে আছে বড় বড় কুমির। সেই দরজা দিয়ে বেরোলে যে কি অবস্থা হবে সে তো বুঝতেই পারছিস! আরেকটা দরজার

সামনেই রয়েছে এক রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে সোজা গেলে তুই ইকবালপুরে গিয়ে পৌঁছবি। তোকে শুধু একবার একটা প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হবে। প্রশ্নটা তুই যে কোনও পাহারাদারকে করতে পারিস। কিন্তু প্রশ্নটা এমনভাবে করবি যাতে উত্তর শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' হয়। মাথায় ঢুকেছে ?' ভয়ে ভয়ে বললাম, 'হ্যাঁ'। তখন ষাঁড়টা বলল, 'যাঃ, পালা এবার আমার সামনে থেকে।'" এই বলে লাট্টু আমায় জিজ্ঞেস করল, "এইবার বল তো দুর্গ থেকে পালাতে পারলাম কিনা ?"

"না পালালে কি আর আজকে আমায় এইসব প্রশ্ন করতে পারতে ?"

আমি হেসে ফেললাম।

লাট্টু একটু থতমত খেয়ে বলল, "আচ্ছা আচ্ছা, কি করে বেরোলাম সেটা বল।"

ঘটনাটা পুরোপুরি একবার ভেবে নিয়ে বললাম, "এটা তো মনে হচ্ছে খুব কঠিন সমস্যা।"

"কঠিন বলেই তো তোমায় দিলাম, একটু আগে যে বড় বুদ্ধির বড়াই করছিলে !"

"বাঃ, তার মানে কি সবকিছু পারতে হবে নাকি !"

"তা নয়, তবে না ভেবে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন ? বিশেষ করে আমার প্রাণ যখন নির্ভর করছে উত্তরটার উপরে।"

আমি একটু ভাবার চেষ্টা করলাম। প্রথমেই সন্দেহ হল দুর্গের মালিক সত্যবাদী কিনা। কারণ সেও তো মন্ডলপুরের লোক।

"একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না, "আমি বললাম, "দুর্গের মালিক সত্যবাদী, না মিথ্যাবাদী ?"

লাট্টু বলল, "ভাল করে ভেবে দেখ, উত্তরটা আমি যা বলেছি, তার মধ্যেই আছে।"

লাট্টুর কথা শেষ হতেই আমার খেয়াল হল। বললাম, "বুঝেছি, বুঝেছি, তাকে সত্যবাদী হতেই হবে।"

"কেন ?"

"নইলে সে কখনোই বলত না যে দুজন পাহারাদারই নিজেকে বলে, সে সত্যবাদী। এটাও অনেকটা তোমার আগের প্রশ্নের মত।"

"যাক যাক, এটা যে পেরেছ, আমার মহাভাগ্য ! এবার বার কর, আমি কি প্রশ্ন করেছিলাম ।"

লাট্টুর মুরুব্বিয়ানা আমার অসহ্য লাগতে শুরু করেছে। তাও আমি কিছুক্ষণ ধরে ভাবলাম। অজানা অচেনা জায়গায় এসে পড়েছি, সাহায্যের কিছু দরকার হবেই। ছেলেটা কথা দিয়েছে, কিছু সাহায্য হয়ত করবে ! কিন্তু কিছুই আমার মাথায় এল না। শেষমেষ হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, "আমার মাথায় কিচ্ছু আসছে না।"

লাট্টু অত সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। বলল, "মাথাটা আরেকটু খাটাও। আচ্ছা একটা ক্লু দিচ্ছি। তোমাকে এমন একটা প্রশ্ন করতে হবে যে সত্যবাদী-মিথ্যাবাদী যাকেই কর উত্তরে কোনও তফাৎ হবে না।"

"সেটাই তো আমি বুঝছি না, কারণ সত্যবাদী সত্য উত্তর করবে, আর মিথ্যাবাদী মিথ্যা।"

"বেশ তো, তাহলে এমন একটা প্রশ্ন কর যাতে দুজন পাহারাদারকেই উত্তরের মধ্যে জড়াতে পার।"

আমি চুপ করে রইলাম।

"নাঃ, মাথাটা তোমার একেবারে ফোঁপরা হয়ে গেছে। একটা বুদ্ধিবটিকা খেয়ে দেখবে নাকি ?"

"না।"

"ভয় নেই, পয়সা-টয়সা কিছু চাইব না।"

"পয়সার জন্য বলছি নাকি ! খামাখা ওষুধ খেতে আমার ভাল লাগে না।"

"ও", বলেই লাট্টু নিজে আবার দুটো বড়ি গিলে ফেলে, কিছুক্ষণ বুঁদ হয়ে বসে রইল। তারপর বলল, "আমি কিপ্রশ্ন করেছিলাম শুনবে না ?"

যদিও জানতে খুব ইচ্ছে করছিল, কিন্তু বেশী আগ্রহ দেখিয়ে লাভ নেই। শুকনোভাবে বললাম, "বললে নিশ্চয় শুনবো।"

'আমি একজন পাহারাদারকে গিয়ে বললাম, "আচ্ছা আমি যদি ওই পাহারাদারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি যে তার দরজার সামনে খাল আছে কিনা, তাহলে সে কি উত্তর করবে ?" বুঝতে পেরেছ এখন উততরটা কি হবে ?"

"একটু ভাবতে হবে।"

"ভাবাভাবির কি আছে এর মধ্যে ? ধর প্রথম পাহারাদার, যাকে আমি প্রশ্ন

করেছি, সে হচ্ছে সত্যবাদী। তাহলে অন্য পাহারাদারটা হবে মিথ্যেবাদী। এবার ধর, মিথ্যেবাদীর দরজার সামনে সত্যি সত্যিই খাল আছে। তাহলে মিথ্যেবাদী পাহারাদারের উত্তর হবে 'না', আর সত্যবাদী পাহারাদার সেই উত্তরটাই আমাকে বলবে। এবার অন্য সম্ভাবনাটা বিচার কর। ধর, প্রথম পাহারাদার মিথ্যেবাদী, আর দ্বিতীয়জন সত্যবাদী। তাহলে দ্বিতীয় পাহারাদারের উত্তর হত, 'হ্যাঁ', আর প্রথম পাহারাদার সেটাকে উল্টো করে বলত 'না'। তাহলে দাঁড়াল এই যে, 'না'-এর অর্থ হল, দ্বিতীয় দরজার সামনে খাল আছে।"

এখন বুঝতে পারলাম লাট্টু একটু আগে কি বলেছিল। সত্যবাদী আর মিথ্যেবাদীকে একই উত্তরের মধ্যে জড়ান মানে, উত্তরটা সবসময় মিথ্যে হবে। কারণ, হয় সত্যবাদীর উত্তরটা মিথ্যেবাদী উল্টো করে বলবে, বা মিথ্যেবাদীর মিথ্যে উত্তরটাই সত্যবাদী আবার রিপিট করবে। নিজের মনেই প্রায় বললাম, "বাঃ, বেশ চালাকির প্রশ্ন তো!"

লাট্টু খুশী হল, "যাক্, মাথার ঘিলুটা সম্পূর্ণ গুলে খাওনি তাহলে। কিন্তু এবার বল তো কি করে প্রশ্নটা আমার মাথায় এল?"

"কি করে?"

"এই বটিকাগুণে," শিশি ভর্তি কালো বড়িগুলো লাট্টু আমাকে দেখাল, "খেয়ে দেখবে নাকি একটু?"

"ধ্যেৎ, বললাম যে 'না'।"

"একটা ভেঙে দিতে পারি, যদি বেশি না চাও।"

"একটুও চাই না আমি। আমার অল্প -স্বল্প যা বুদ্ধি আছে, তাতেই আমি খুশী।"

"এক রত্তিও না?"

"কতবার বলতে হবে? না-না-না!"

"আহা-হা চট কেন। একবার 'না' বললেই হয়! আমি কি আর জোর করছি!"

লোকটা ভারি নাছোড়বান্দা, কিন্তু ওর কাথাগুলো শুনতে ভাল লাগছে। বললাম, "তারপর কি হল?"

"কিসের কি হল?"

"দুর্গের দরজা দিয়ে বেরিয়ে কোথায় গেলে?"

"ও হ্যাঁ, সেখান থেকে বেরিয়ে, রাস্তা ধরে সোজা গেলাম ইকবালপুরে। ইকবালপুরে অবস্থাটা আরেকটু গোলমেলে। সেখানে সত্যবাদী, মিথ্যাবাদী ছিলই, এ ছাড়া ছিল আরেক ধরনের লোক যাদের বলা যায় উভয়বাদী। তারা পর পর সত্যি আর মিথ্যে বলে। অর্থাৎ তাদের প্রথম কথাটা যদি সত্যি হয়, তাহলে ঠিক পরের কথাটাই হবে মিথ্যে, আর তার পরের কথাটা হবে সত্যি, এরকম। বুঝতে পারছ তো ?"

"'কথা' বলতে কিতুমি 'বাক্য' বোঝাচ্ছ ?"

"ঠিক ধরেছ।"

"কিন্তু উভয়বাদীর প্রথম কথাটা কি হবে ?"

"সেটাই হচ্ছে মুশকিল, আগে থেকে জানার কোনও উপায় নেই।"

"বাপরে, ভারি গোলমেলে জায়গা তো !"

"ইকবালপুরে আমি যখনপৌঁছলাম, তখন আমার হাতে একদম সময় নেই। কারণ কোকচিনের বাস ছাড়তে মাত্র মিনিট তিনেক বাকি।"

"কোকচিনটা আবার কোথায় ?"

"কোকচিন হচ্ছে ইকবালপুর থেকে মাইল দশেক দূর। সেখান থেকে ট্রেন ধরে আমায় যেতে হবে ফুসমন্তরপুরে। ওখানে আমার খুড়তোত দাদার শ্বশুরবাড়ি।"

"তারপর" ?

"বাস টার্মিনাসের কাছে গিয়ে দেখি সেখানে তিনটে বাস দাঁড়িয়ে আছে, একটা লাল, একটা নীল, আরেকটা সবুজ রঙের। কোন বাসটা কোকচিন যাবে ভাবছি, এমন সময় দেখি তিনজন কন্ডাক্টর গুমটি থেকে বেড়িয়ে বাসগুলোর দিকে এগোচ্ছে, আর বাসগুলোও প্রায়. ছাড় ছাড়। আমি দৌড়ে গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি ধরনের লোক, আর কোন বাসটা কোকচিন যাবে।

প্রথমজন উত্তর দিল, 'আমি মিথ্যেবাদী নই। লালবাস উল্টোপুরী যাচ্ছে। নীলবাস কোকচিন যাচ্ছে।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'আমি উভয়বাদী নই। নীলবাস কোকচিন যাচ্ছে না। লালবাস কোকচিন যাবে।'

তৃতীয়জন বলল, 'আমি সত্যবাদী। সবুজবাস কোকচিন যাবে। লালবাস উল্টোপুরী যাচ্ছে না।'

এখন বল তো আমি কোন বাস ধরলাম ?"

এইসব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাট্টুর কি লাভ কে জানে ! সমস্যাগুলোর সমাধান তো আগেভাগেই ও করে ফেলেছে। তবে কেন শুধু শুধু আমাকে ফাঁসাচ্ছে ! মুখে বললাম, "এটা তো ভয়ানক জটিল, কারণ সত্যবাদী, মিথ্যেবাদী, বা উভয়বাদী—সবাই নিজেকে সত্যবাদী বলতে পারে।"

"তা পারে।"

"অথবা,বলতে পারে যে সে মিথ্যাবাদী নয়।"

"তাও সম্ভব।"

"তাহলে তার থেকে কি বোঝা যাবে ?"

"প্রশ্নটা তো আমি তোমাকে করলাম, তুমি এর জবাব দেবে।"

"কিন্তু কন্ডাক্টররা কি বলেছে, আমার যেসব গুলিয়ে গেছে ?"

"ঘাবড়াও মৎ," এই বলে লাট্টু তার ঝোলা থেকে একটা কাগজ বের করে আমাকে দিল। দেখলাম কন্ডাক্টরদের কথাগুলো সব সেখানে লেখা আছে। কি যন্ত্রণা !

যদিও প্রশ্নটা কঠিন, কিন্তু আস্তে আস্তে এগোলে উত্তরটা হয়ত পেয়ে যেতে পারি। আমার কেমন জানি মনে হল, 'আমি উভয়বাদী নই' কথাটার মধ্যে একটা রহস্য লুকিয়ে আছে। সেটা লাট্টুকে বলতেই, ও চোখ বুজে মন্তব্য করল, "মোক্ষম্, মোক্ষম্ !"

সত্যবাদী অবশ্যই বলবে, আমি উভয়বাদী নই, কিন্তু মিথ্যাবাদী কি তা বলবে ? কক্ষনো নয়, কারণ সে ক্ষেত্রে কথাটা সত্যি হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন, উভয়বাদীর পক্ষে সেটা বলা সম্ভব কিনা। অবশ্যই সম্ভব, যদি ধরা হয় সে মিথ্যে বলছে। তাহলে দাঁড়াল যে দ্বিতীয় কন্ডাক্টরটি হয় সত্যবাদী, অথবা উভয়বাদী। সে যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে তো চুকেই গেল। তার অর্থ, লালবাস কোকচিনে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা জানা যাবে কি করে ? হঠাৎ আমার খেয়াল হল যে দ্বিতীয় কন্ডাক্টরের দ্বিতীয় কথাটা সবসময়ই সত্যি হতে হবে। সে যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে তো হবেই। সে যদি উভয়বাদী হয়, তাহলেও হবে। কারণ সে ক্ষেত্রে তার প্রথম কথাটা হয়ে যাচ্ছে মিথ্যে, আর আমরা জানি, উভয়বাদীরা পর্যায়ক্রমে সত্যি-মিথ্যে বলে। এখন দ্বিতীয় কথাটা হচ্ছে নীলবাস কোকচিনে যাচ্ছে না। সেটা সত্যি হওয়া মানে প্রথম কন্ডাক্টরের কথাটা মিথ্যে হয়ে যায়, কারণ সে বলেছে নীলবাস কোকচিনে যাচ্ছে।

অতএব প্রথম কন্ডাক্টর নিশ্চয় মিথ্যেবাদী। আমার যুক্তিগুলো দিয়ে লাট্টুকে বললাম, "প্রথম কণ্ডাক্টর নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।"

লাট্টু মাথা নাড়ল। বলল, "তুমি প্রমাণ করেছ যে প্রথম কন্ডাক্টরের একটা কথা মিথ্যে। তার মানে এই নয় যে সে মিথ্যেবাদী, সে উভয়বাদীও হতে পারে।"

তাও তো বটে আবার চিন্তায় পড়লাম।

"আরে, এতে এত চিন্তার কি আছে ? উভয়বাদী হলে প্রথম কন্ডাক্টরের প্রথম কথাটা হচ্ছে সত্যি, সে ক্ষেত্রে তার তৃতীয় কথাটাও সত্যি হতে হবে। তৃতীয় কথাটা হচ্ছে, নীলবাস কোকচিন যাচ্ছে। কিন্তু তুমি একটু আগেই প্রমাণ করেছ সেটা সত্যি নয়। অতএব প্রথম কন্ডাক্টর উভয়বাদী হতে পারে না, সে মিথ্যেবাদী।"

"তাই তো আমি বললাম একটু আগে।"

"বলেছিলে ঠিকই, কিন্তু যুক্তিতে গলদ ছিল। আর সেটা হচ্ছে না বলারই সমান। ওসব থাক এখন, আগে আমার প্রশ্নের উত্তরটা বার করবে।"

"প্রথমজন যদি মিথ্যেবাদী হয়, তাহলে বাকি রইল সত্যবাদী, আর উভয়বাদী।"

"উঁহু, সেটা চিন্তা করা ভুল। আমার আগে থেকে জানা অসম্ভব যে কন্ডাক্টররা তিনধরণের লোক ছিল কিনা। তিনজনের মধ্যে মিথ্যেবাদীর সংখ্যা একজনের বেশীও হতে পারে।"

"তার মানে তৃতীয়জন মিথ্যেবাদীও হতে পারে ?"

"নিশ্চয় পারে, আপত্তি কিসের !"

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে দেখলাম, সেটা হওয়া অসম্ভব। যেহেতু প্রথমজন মিথ্যেবাদী, তার প্রত্যেকটা কথাই মিথ্যে। তা যদি হয়, তাহলে লালবাস উল্টোপুরী যাচ্ছে না। কিন্তু ঠিক এটাই তৃতীয়জন তার তৃতীয়কথায় বলেছে। অতএব, কখনোই মিথ্যেবাদী হতে পারে না। আরেকটু চিন্তাকরে দেখলাম, তৃতীয়জন সত্যি উভয়বাদীও নয়। উভয়বাদী হতে হলে তার প্রথম কথাটা হতে হবে (কারণ, তার তৃতীয় কথাটা সত্যি)। প্রথম কথাটা হচ্ছে, 'আমি সত্যবাদী'। উভয়বাদীর ক্ষেত্রে, সে কথাটা মিথ্যে হবে। অতএব তৃতীয়জন হচ্ছে সত্যবাদী। ব্যাস সমস্যাটা চুকে গেল। আমি বললাম, "তুমি সবুজ বাস ধরেছিলে।"

"ব্রাভো, ব্রাভো !" লাট্টু চটাস চটাস করে আমার পিঠ চাপড়ে দিল। "দেখছতো বুদ্ধিটা কেমন দিব্বি খুলে যাচ্ছে ?" বন বন চক্কর চলল আবার কিছুক্ষণ।

বলতে কি, আমি নিজের কৃতিত্বে অভিভূত হচ্ছি। আর প্রশ্নগুলোর জবাব দিতেও বেশ মজা লাগছে। "তারপর কি হল ?"

"সত্যি শুনতে চাও ?"

"নইলে জিজ্ঞেস করছি কেন ?"

"তারপরতো কোকচিন গিয়ে পৌঁছলাম। কোকচিন আবার একটু অদ্ভুত ধরনের জায়গা।"

"সব জায়গাগুলোতো আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে।"

"না, না, এটা একটু অন্যরকমের অদ্ভুত। কোকচিনে দু' ধরনের লোক থাকে। একদলকে বলা হয় মানুষ, আরেকদলকে অমানুষ।"

"অমানুষেরা কি অন্যরকম দেখতে ?"

"উঁহু, দেখতে তাদের একই রকম, বাইরের থেকে বোঝার জো নেই।"

"তাহলে তফাৎটা কোথায় ?"

"সেটাইতো বলতে যাচ্ছি। মানুষরা তাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সবসময় সত্যিকথা বলে। অমানুষদেরও নিজস্ব জ্ঞান ও বিশ্বাস আছে। কিন্তু যেহেতু তারা অমানুষ, তারা তাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসের উল্টো কথা বলে।"

"তাহলে বললেই হয়, মানুষরা সত্যবাদী, আর অমানুষরা মিথ্যেবাদী।"

"ঠিক তা নয়, আরেকটু শুনলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে তোমার কাছে। কোকচিনের লোকদের আবার একটু অন্যরকম ভাবেও ভাগ করা যায়, প্রকৃতস্থ ও অপ্রকৃতস্থ। প্রকৃতস্থরা সত্যকে সত্য বলে জানে, আর অপ্রকৃতস্থরা মিথ্যেকে সত্যি বলে ভাবে, সত্যিকে মিথ্যে।"

"তার মানে কি প্রকৃতস্থরা দিনকে দিন বলে ভাববে, অপ্রকৃতস্থরা ভাববে সেটা রাত্রি ?"

"বা ! বা ! ঠিক ধরেছ। তাহলে এখন কি দাঁড়াল ? অর্থাৎ বলতে গেলে কোকচিনের লোকদের চারভাগে ভাগ করা যায় :

প্রকৃতস্থ মানুষ,
অপ্রকৃতস্থ মানুষ,

প্রকৃতস্থ অমানুষ,
অপ্রকৃতস্থ অমানুষ।

এবার আমার ঝামেলাটা বোঝ ! স্টেশনে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন দেখি দুটো ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। একটা হচ্ছে সাত নং আপ, আর একটা ১০নং আপ। আমি জানি দুটোর মধ্যে একটা যাচ্ছে ফুসমন্তরপুরে। স্টেশনমাস্টার সামনেই দাঁড়িয়ে তার কাছে খবর নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি ঠিক জানি না, তিনি কি ধরনের লোক। উত্তরটা বুঝতে আবার ভুল না করে বসি !'

এবার বল, কি ভাবে আমি উত্তরটা বার করলাম ?"

"ক'টা প্রশ্ন করতে পারা যাবে ?"

"য'টা খুশী। তবে স্টেশনমাস্টার ব্যস্ত মানুষ, তাঁকে অকারণে বেশী প্রশ্ন না করাই ভাল।"

এতক্ষণে একটা জিনিস বুঝেছি যে স্টেশন মাস্টার কি ধরনের লোক সেটা আগেভাগেই জানতে হবে, নইলে উত্তরের মাথামুন্ডু কিছুই বার করা যাবে না। এখন তাঁকে যদি প্রশ্ন করা যায়, তিনি কি ধরনের লোক ; তাহলে তিনি কি উত্তর দিতে পারেন ? তিনি যদি প্রকৃতস্থ মানুষ হন, তাহলে নিশ্চয় তিনি বলবেন, 'আমি প্রকৃতস্থ মানুষ।' এ বিষয় কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি যদি প্রকৃতস্থ অমানুষ হন ? সেক্ষেত্রে মনে হল, যেহেতু তিনি অমানুষ, তিনি উল্টো করে বলবেন, প্রকৃতস্থ মানুষ। আমার আর্গুমেন্টগুলো লাট্টুকে বললাম। সে বলল, "তোমার প্রথম কনক্লুশনটা ঠিক, কিন্তু দ্বিতীয়টা ভুল। অমানুষরা সবকিছু উল্টো বলে। প্রকৃতস্থের উল্টো হচ্ছে অপ্রকৃতস্থ, আর অমানুষের উল্টো হচ্ছে মানুষ। তাই প্রকৃতস্থ অমানুষ নিজেকে বলবে অপ্রকৃতস্থ মানুষ।"

"ও হ্যাঁ।" ভুলটা বুঝতে পারলাম। "এবার তোমায় বলি, অপ্রকৃতস্থ মানুষ নিজেকে কি বলবে। যেহেতু সে অপ্রকৃতস্থ , তার ধারণা সে মানুষ নয়, অমানুষ। আর অমানুষরা সবসময় উল্টোকথা বলে। অতএব সে নিজেকে বলবে, প্রকৃতস্থ মানুষ।"

"দূর, দূর ! এবারও ভুল হল। দুটো ব্যাপারে তোমার গুলিয়ে যাচ্ছে। প্রথমতঃ, অপ্রকৃতস্থরা সবসময়ই উল্টোভাবে। সুতরাং অপ্রকৃতস্থ মানুষের

বিশ্বাস, সে শুধু অমানুষ নয়, সে প্রকৃতস্থও। কিন্তু তোমার দ্বিতীয় ভুলটা বুঝতে হলে আরেকটু গভীরে যেতে হবে। কেউ নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সোজা না উল্টো বলবে, সেটা নির্ভর করছে লোকটা আসলে মানুষ না অমানুষ, তার উপরে। নিজের সম্পর্কে তার কি বিশ্বাস, তার উপরে নয়। এক্ষেত্রে লোকটা হচ্ছে মানুষ, তাই তার উত্তর হবে, প্রকৃতস্থ অমানুষ।"

"বাপরে, কি গোলমেলে! কিন্তু এবার মনে হয় বুঝেছি। তার মানে অপ্রকৃতস্থ অমানুষ নিজেকে বলবে অপ্রকৃতস্থ অমানুষ। কারণ অপ্রকৃতস্থ বলে তার ধারণা, সে প্রকৃতস্থ তো বটেই, তার উপর সে মানুষ। কিন্তু যেহেতু আসলে সে অমানুষ, সে তার ধারণার পুরোপুরি উল্টো বলবে।"

"চমৎকার এই তো দিব্বি বুঝেছ। তারমানে প্রথম প্রশ্নেই বুঝে যাচ্ছ যে স্টেশনমাস্টার কি ধরনের লোক। এবার বল কিভাবে আমি ঠিক ট্রেনটা বার করব।"

আমি মনটাকে খুব কনসেন্‌ট্রেট করে শুরু করলাম, "ধরা যাক্, সাত নম্বর আপ যাচ্ছে ফুসমন্তরপুরে। এবার মনে করি, আমি স্টেশনমাস্টারকে প্রশ্ন করলাম যে এই ট্রেন ফুসমন্তরপুরে যাচ্ছে কিনা। তিনি যদি প্রকৃতস্থ মানুষ হন, তাহলে তো চুকেই গেল। তিনি বলবেন, 'হ্যাঁ।'

"যদি তিনি অপ্রকৃতস্থ মানুষ হন?"

"তাহলে যেহেতু তিনি অপ্রকৃতস্থ মানুষ, তাঁর বিশ্বাস হবে যে ৭ নম্বর আপ ফুসমন্তরপুর যাচ্ছে না এবং যেহেতু তিনি মানুষ, তিনি সেই বিশ্বাস অনুযায়ী বলবেন, 'না'।"

"ঠিক। এখন বল অপ্রকৃতস্থ অমানুষ হলে কি হবে?"

"এটাও ঠিক আগেরই মত। শুধু এক্ষেত্রে স্টেশনমাস্টার অমানুষ বলে, তিনি তাঁর বিশ্বাসের উল্টো বলবেন। অর্থাৎ তাঁর উত্তর হবে, 'হ্যাঁ'।

"এবারও ঠিক। ব্যাস, তুমি সেকেন্ডক্লাস পেয়ে পাশ করে গেছ। তারপর কি হল শুনতে চাও?" লাট্টু পকেট থেকে একটা খড়কে বার করে সেটা চিবতে চিবতে প্রশ্ন করল। এতমাথা ঘামিয়ে উত্তর দিলাম, তবু কিনা সেকেন্ড ক্লাস! আমার মাথাটা গরম হল। "সেকেন্ড ক্লাস কেন হবে? সবকিছু ঠিক ঠিক বলেছি!"

লাট্টু আমার রাগ থেকে বলল, "ছি-ছি রাগ ক রতে নেই। এর পরেরটা বলতে পারলেই, ধাঁ করে ফার্স্ট ক্লাস দিয়ে দেব।"

আমি গজ গজ করছি, লাট্টু এদিকে বলে চলেছে, "তারপর আমি গিয়ে পৌঁছলাম ফুসমন্তরপুরে। সে জায়গাটা আরও গেলামেলে। সেখানে মানুষ-অমানুষতো আছেই, আর আছে গমানুষ। গমানুষরা পর্য্যায়ক্রমে মানুষ আর অমানুষের কথা বলে। সেখানেও আবার লোকেদের প্রকৃতস্থ আর অপ্রকৃতস্থ হিসেবে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ কিনা ফুসমন্তরপুরে মোট ছ' ধরনের লোক আছে :

প্রকৃতস্থ মানুষ,
অপ্রকৃতস্থ মানুষ,
প্রকৃতস্থ অমানুষ,
অপ্রকৃতস্থ অমানুষ,
প্রকৃতস্থ গমানুষ,
অপ্রকৃতস্থ গমানুষ।
..... ।"

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। "চুপ কর ! ব্যাপারটা এবার এমন ঘোলাটে করে তুলেছ, যে কেউ এ গল্প আর শুনতে চাইবে না। এমনি করে বাড়িয়েই বল না—ঘমানুষ, বাঁদরমানুষ, অজমানুষ,...যা খুশী তাই ! কার দায় ঠেকেছে এসব জানতে ?"

"তাই নাকি ?" লাট্টু একটু ভাবিত হল, "তাহলে কি করবে ?"

"আগে ছোড়দাকে খুঁজে বার করব।"

"তা সেটা বললেই হয় ? একটু দাঁড়াও, দেখি।" বলেই লাট্টু অদৃশ্য হল। আমি বসেই আছি, বসেই আছি, ব্যাটার পাত্তা নেই। তখন সন্দেহ হল, নিশ্চয় সরে পড়েছে। "দুত্তেরি", বলে পিছন ফিরে দেখি ছোড়দা আর প্রফেসর ফেনী পাগড়ি মাথায় একটা ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে।

॥ পাঁচ ॥

আমাকে দেখেই ছোড়দা কটমট করে তাকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বকে নিল। যেন হারিয়ে যাওয়ার দোষটা সম্পূর্ণ আমার ! তারপর বলল, "আমি প্রফেসর ফেনীকে গুপ্তধনের কথা বলেছি। উনি আমাদের সাহায্য করতে রাজি

হয়েছেন। লাট্টুরাম এক্ষুণি যাচ্ছে রাজপুরীতে। ভাগ্যিস তোর দেখা পেলাম, নইলে খুব ঝামেলা হত।" সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝলাম লাট্টুরাম আর লাট্টু সিং-এর মধ্যে আমি গুলিয়ে ফেলেছিলাম। দুজনে এক নয়। লাট্টুরামের কথাই প্রফেসর ফেনী আমাদের বলেছিলেন। লাট্টুরামের টমটমে উঠে ছোড়দাকে লাট্টু সিং-এর কথা বললাম। প্রফেসর ফেনী দেখলাম লাট্টু সিংকে চেনেন। বললেন, "খুব চিনি, বুদ্ধিমান ছোকরা। তবে গুলি খেয়ে খেয়ে ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করছে।"

আমি বললাম, "গুলি কোথায়, ওটাতো বুদ্ধিবড়ি।"

"ক্ষেপেছ! ওই গল্প ফেঁদেই ওগুলো ও বিক্রি করে। তোমাকে আবার গছায়নি তো?"

"খেতে বলেছিল আমাকে, আমি খাইনি।"

"ভাল করেছ, ওষুধ খেয়ে কি কখন বুদ্ধি বাড়ে!" এবার প্রফেসর ফেনী ছোড়দাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভালকথা রাজার জন্য কিছু ভেট এনেছো তো?"

"ওই যাঃ, না তো। রাগ করবেন নাকি?"

"বলা শক্ত, রাজারাজড়ার ব্যাপারতো। শুনেছি লোকটা আবার পরম ক্ষ্যাপা।"

"এই সেরেছে!"

"আমার এক বন্ধু কিছুদিন রাজসভায় ছিল, তার কাছেই ক্ষ্যাপামির কথা অল্পস্বল্প শুনেছি।

'কি ধরনের কথা?"

"ওফ্‌, যা পাগলামি করেন! যেমন ধর, একবার রাজা সভার সমস্ত পন্ডিতদের চোখ বেঁধে, তাদের টিকিতে একটা করে রিবন বেঁধে দিয়েছিলেন। তারপর পণ্ডিতদের চোখ খুলে দিয়ে বললেন যে সবগুলো রিবনের মধ্যে অন্ততঃ একটা রিবনের রং লাল। পণ্ডিতদের কাজ হচ্ছে, হিসেব কষে নিজের রিবন লাল কিনা বার করা। সেটা বারকরতে পারলেই রাজাকে জানাতে হবে। কিন্তু যখন তখন জানালে চলবে না। রাজদ্বারী পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর একটা করে ঘন্টা বাজাবে, ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই রাজাকে সেটা জানাতে হবে। বোঝ ঠ্যালা, ক্ষ্যাপামী আর কাকে বলে!"

"তারপর কি হল?"
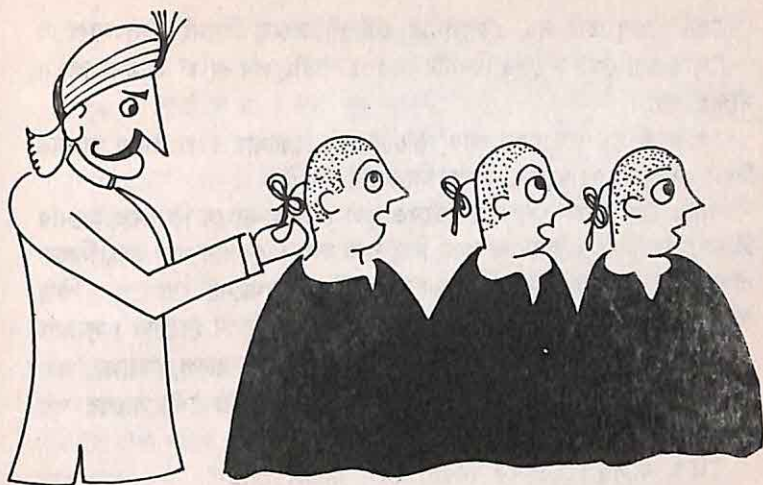
"রাজা এসব বল্যর পর একজন পন্ডিত জিজ্ঞেস করেছিল, ঠিক বলতে পারলে কোনও পুরস্কার পাওয়া যাবে কিনা। রাজার উত্তর ছিল, ঠিক বললে চাকরি টিঁকে থাকবে, কিন্তু ভুল বললে চাকরির সঙ্গে গর্দানও যাবে।"

উঃ কি ভয়ানক ! রাজাকে তো মনে হচ্ছে শুধু ক্ষ্যাপা নয়, পাষণ্ডও !"

"আমরাও বিপদে না পড়ি।" ছোড়দা চিন্তিতস্বরে বলল।

"যতটা খারাপ ভাবছ, ততোটা নয়," প্রফেসর ফেনী আমাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন। "শুনেছি রাজা যতটা গর্জায়, ততটা বর্ষায় না। ভয়টয় যা দেখানোর, বেশীর ভাগ সময়ই সেগুলো মুখে মুখে। তবে সবাইকে নানান প্যাঁচে ফেলেই ওঁর আনন্দ !"

"আচ্ছা পন্ডিতরা কি করল, তাতো বললেন না।"

"কি আর করবে ? কিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচায়ি করল। এদিকে রাজদ্বারীতো ঘণ্টা বাজাতে শুরু করেছে। একবার, দু'বার, তিনবার, 'চারবার, কারুর মুখে রা' নেই। পাঁচবারের বার পাঁচজন পণ্ডিত এগিয়ে এসে বলল যে তাদের টিকির রিবন হচ্ছে লাল।"

"ভারি আশ্চর্য তো," ছোড়দা বলল, "সত্যিই কি তাদের রিবন লাল ছিল ?"

"হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, কেবলমাত্র ওই পাঁচজনের রিবনই ছিল লাল।"

"পন্ডিতরা কেউ নিজের রিবনটা দেখতে পারছিলেন না ?" আমার কেমন সন্দেহ হল।

"অবশ্যই নয়। তাহলে আর প্যাঁচটা রইল কোথায় ? প্রত্যেকে অন্যের রিবন দেখতে পারছিলেন, কিন্তু নিজেরটা নয়।"

আমি তো আকাশ পাতাল ভেবেও কূল পেলাম না যে কি করে অন্যের রিবন দেখে নিজের রিবন সম্পর্কে কিছু বলা যায় ! একবার মনে হল, নিশ্চয় রাজসভার কোথাও একটা আয়নাটায়না ছিল, সেখানেই দেখেছে। কিন্তু প্রফেসর ফেনী পরিষ্কার বলেছেন যে কেউই নিজের রিবণ দেখেনি। সুতরাং সেই সম্ভাবনাটা বাতিল করতেই হয়। ছোড়দা হঠাৎ বলল, "আচ্ছা, যদি আটজন পণ্ডিতের লাল রিবন থাকত, তাহলে আটবার ঠণ্টা বাজার পর পণ্ডিতরা বলতে পারত ?"

"ঠিক বলেছ ! তোমার বুদ্ধিটা বেশ ধারাল তো !"

ইন্টারেস্টিং ! আমি ভাবলাম, ঘণ্টার সঙ্গে তাহলে লাল রিবনের কিছু যোগ আছে। যদি শুধু একটা লাল রিবন থাকত, তাহলে প্রথম ঘণ্টাতেই উত্তরটা বেরিয়ে যেত।

ছোড়দা বলল, "একটা রিবন থাকলে কি হত, মনে হয় আমি সেটা বুঝতে পেরেছি।"

প্রশ্ন করলাম, "কি বুঝলি ?"

"রাজা বলেছিলেন যে অন্ততঃ একটা লাল রঙের রিবন আছে। যদি লাল রঙের রিবন শুধু একটা হত ; তাহলে যে পণ্ডিতের টিকিতে সেটা ছিল, সে অন্যকোথাও লাল রিবন না দেখতে পেয়ে বুঝে ফেলত, তার রিবনটাই লাল। আর প্রথম ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই রাজাকে সেটা জানাত।"

চমৎকার !" প্রফেসর ফেনী উচ্ছ্বসিত ! "আর দুটো রিবন থাকলে কি হত ?"

আমি জানতাম ছোড়দা নিশ্চয় উত্তর দিতে পারবে।

"সেটাই ভাবছি। ধরাযাক, এক নম্বর আর দু'নম্বর পণ্ডিতের টিকিতে রিবন দুটো বাঁধা ছিল। প্রথম ঘণ্টা বাজলে কেউই কিছু বলত না, কারণ সবাই অন্ততঃ একটা লাল রিবন দেখতে পারছে। কিন্তু প্রথম ঘণ্টার পর কেউ যখন কিছু বলল না, তখন এক নম্বর ও দু'নম্বর—দুই পণ্ডিতই বুঝতে

পারত, লাল রিবনের সংখ্যা হচ্ছে দুই।"

"কেন ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"বুঝতে পারছিস না ? যদি শুধু একটা লাল রিবন থাকত, তাহলে যার টিকিতে সেটা ছিল, সেতো সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারতো !"

"তা বটে" এবার আমি বুঝতে পারলাম্।

ছোড়দা তবু আরেকবার ভাল করে বোঝাল, "প্রথম ঘণ্টা বাজার পর এক নম্বর পন্ডিত ভাবল, সে দেখতে পারছে মাত্র একটা লাল রিবন, আর সেটা বাঁধা দু'নম্বরের টিকিতে। কিন্তু লাল রিবনের সংখ্যা নিশ্চয় এক নয়। কারণ, সেক্ষেত্রে দু'নম্বর পন্ডিত প্রথম ঘণ্টা বাজলেই রাজাকে রিবনের খবর জানাত। কিন্তু দু'নম্বর কিছু বলেনি। তার মানে সে অন্যকোথাও একটা লাল রিবন দেখেছে। সেটা একমাত্র সম্ভব যদি এক নম্বরের টিকিতে দ্বিতীয় লাল রিবনটা বাঁধা থাকে। এখন, দু'নম্বর পণ্ডিতও ঠিক একইভাবে চিন্তা করবে। তার মানে···।"

"তার মানে দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজলে দুই পণ্ডিতই রাজাকে রিবনের খবর জানাবে।" আমি বলে উঠলাম।

প্রফেসর ফেনী সস্নেহে ছোড়দার দিকে চেয়ে বললেন, "তোমার লজিকটা বেশ পরিষ্কার। কোন সময় আমার ক্লাসে ছিলে নাকি ? যাক্, এখন বুঝতে পারছ তো তিনটে লাল রিবন থাকলেও কোনও অসুবিধা নেই। তুমি দুটো লাল রিবনের সমস্যা সমাধান করেছ। সেটাকে ধরে নিয়ে তুমি তিনটের সমাধানও করতে পারবে। তার থেকে চারটে, তার থেকে পাঁচটা।"

"এটাকেই তো বলা হয় 'ইনডাকশন', তাই না ?"

"ঠিক বলেছ !" এই বলে প্রফেসর ফেনী ছোড়দার সঙ্গে লজিক নিয়ে বিরাট আলোচনা জুড়ে দিলেন। আমি টমটমের ছোট্ট জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। রাস্তাটা সরু, তার একপাশে একটা ছোট খাল, অন্যদিকে জঙ্গল। খালের ওপারে পায়ে চলা একটা রাস্তা, তার ধারে ধারে ছোট ছোট বাড়ি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটা বাড়ির পিছনেই বড় বড় বাগান। সেগুলো নানান ধরনের গাছপালায় ভর্তি ; বেশীর ভাগ গাছই আমি কোনওদিন দেখিনি। শুধু তাদের চেহারা অন্যরকম তাই নয়, পাতাগুলোও লাল, হলুদ, নীল, বেগুনী হরেক রকম রঙের। বাড়ি-বাগান ছাড়া বাদবাকি চাষের জমি। ধুধু প্রান্তর, শেষ দেখা যাচ্ছে না। জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে

সামনের দিকে দেখার চেষ্টা করলাম। খালটা একটু এগিয়ে একটা বড় ঝিলের মধ্যে পড়েছে। আর সেই ঝিলের ঠিক মাঝখানে, মনে হচ্ছে যেন জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট প্রাসাদ। নিশ্চয় ধাঁধাপুরীর রাজপুরী!

রাজপুরীতে পৌঁছে রাজার কাছে হাজির হতে খুব একটা তেলখড় পোড়াতে হল না। কথায় কথায় বের হয়ে গেল যে রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ফেনীর পুরনো ছাত্র। তিনিই সব বন্দোবস্ত করে দিলেন। রাজা বাগানের সামনে বারান্দায় বসে চা আর বিস্কুট খাচ্ছিলেন। আমরা নমস্কার টমস্কার সেরে কাগজের কাটিংটা এগিয়ে দিতে,
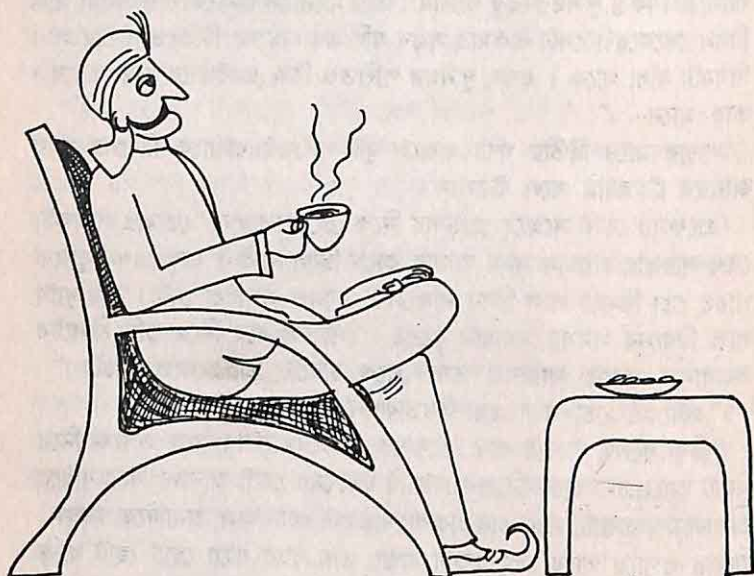
তিনি বললেন, "এ তো আমার ঠাকুর্দার দেওয়া বিজ্ঞাপন। তিনি স্বর্গে গেছেন চল্লিশ বছর হল।"

"তার মানে গুপ্তধনের কোনও খবর পাওয়া যাবে না?"

আমি হতাশ হলাম। এত কাণ্ড করে শেষে এই লাভ! রাজা কড়ে আঙুল

দিয়ে দাঁতের ফাঁকে আটকান বিস্কুটগুলো খুঁটতে খুঁটতে বললেন, "কি করা যাবে বল, তিনি তো আমায় কোনও হদিশ দিয়ে যাননি।"

"যাঃ, শুধু শুধুই কষ্ট করে এলাম," ছোড়দারও খুব আশাভঙ্গ হয়েছে বুঝলাম।

রাজা কাটিংটা ডিশের তলায় রেখে, চা'টা প্রায় ঢক ঢক করে গিলে, ঠ্যাং দুটোকে টেবিলের উপর চাপিয়ে, চোখ বুজে ফেললেন ! আমরা কি করব না বুঝতে পেরে দাঁড়িয়ে আছি, রাজার চোখ খোলার নাম নেই। বেশ কিছুক্ষণ পরে, ডানচোখটা একটু খুলে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "কোত্থেকে আসা হচ্ছে ?"

"দমদম।"

"সে তো অনেকদূর !" স্বগতোক্তি করলেন রাজা। তারপর আবার চোখটোখ বুজে ধ্যানস্থ ! এতো মহা বিপদ ! নিতান্ত রাজা বলে ধাক্কা দিয়ে তুলে দিতে পারি না। কিন্তু এরকমভাবে অনন্তকালতো দাঁড়িয়ে থাকা যায় না !

হঠাৎ রাজা ঠ্যাং নামিয়ে উঠে বসলেন, "নাঃ, এদ্দুর যখন এসেছ, তখন কিছু না পেলে চলবে কেন !"

আমি, ছোড়দা, প্রফেসর ফেনী, তিনজনই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। রাজা তাঁর পাগড়িটা মাথা থেকে খুলে, আঙ্গুলগুলোকে চিরুনীর মত করে চুলগুলোকে চালান দিতে দিতে বললেন, "তোমাদের জন্য একটা সারপ্রাইজের বন্দোবস্ত করতে পারি।"

"কি ধরনের সারপ্রাইজ ?" জিজ্ঞেস করলাম।

"সেটাই যদি বলে দিই, তবে সারপ্রাইজ হল কি ? তবে এটুকু বলতে পারি, সেটা তোমাদের কল্পনাতেও আসবে না। পাবার পরে বলবে, হ্যাঁ, রাজা একটা সারপ্রাইজের মত সারপ্রাইজ দিয়েছেন বটে !"

রাজার সারপ্রাইজ যখন, নিশ্চয় ছোটখাটো কিছু হবে না। আগেকার দিনে রাজারা হীরের আংটি, সোনার হার, মণি-মুক্তো, যখন তখন বিলোত ! এমন কি ছোড়দার বন্ধু অক্রূরদা এই কিছুদিন আগে তার মামার কাছ থেকে দারুণ একটা ক্যামেরা সারপ্রাইজ হিসেবে পেয়েছে। অবশ্যি অক্রূরদা'র মামা আমেরিকাতে ভাল চাকরি করে, খুব বড়লোক। কিন্তু রাজা তো তার থেকে নিশ্চয় অনেকগুণ বেশী বড়লোক !

আমাদের চুপচাপ দেখে রাজা বললেন, "অবশ্য বিনা মেহনতে সারপ্রাইজ পাচ্ছ না। এই রাজ্যে কোনও কিছু বিনা পরিশ্রমে মেলে না, বুঝেছ তো ?"

তা আর বুঝতে বাকি আছে! আমরা ঘাড় নাড়লাম।

"অতি উত্তম, তাহলে এস আমার সঙ্গে।"

রাজার পিছন পিছন প্রথম গোলাপবাগানে ঢুকলাম। পাথর বাঁধান পথের দুপাশে অজস্ররকমের গোলাপ জায়গাটা ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। কম করে পঞ্চাশজন মালী সেখানে খাটছে। রাজাকে দেখে তারা প্রায় মাটিতে নুয়ে প্রণাম করল। গোলাপ বাগানের ঠিক পরেই রাজার টেনিস কোর্ট। টেনিস কোর্টটা তারেরউঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়ার কিছু অংশ আবার সবুজ রঙের মোটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। টেনিস কোর্টের পাশেই হচ্ছে শ্বেতপাথরে বাঁধান সুইমিং পুল। তার চারধারে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, হরেক রঙের চেয়ারের সমাবেশ। সুইমিং পুলের এককোণে একটা বড় স্লাইড, সোজা জলে এসে নেমেছে। তার মানে স্লাইড করে সুইমিং পুলে নেবে পড়া যায়। বড় পুলটার পাশে একটা নিচু ছোট চৌবাচ্চা। সেই চৌবাচ্চাটার জল কেমন জানি উথারি পাথারি করছে। নিশ্চয় ভেতরে কোনও মোটর বা কিছু লাগান আছে।

ছোড়দাকে সেটা দেখাতে, ছোড়দা চাপাস্বরে ধমক লাগল, "কিছু জানিস না তুই, ওটাকে বলে 'হোয়ার্লপুল'।"

সব কিছুই যেন আমাকে জানতে হবে! হোয়ার্লপুলে কি হয় কে জানে ? এখন বেশী প্রশ্ন করলে ছোড়দা ক্ষেপে যাবে, পরে এক সময়ে জেনে নিতে হবে।

টেনিসকোর্ট আর সুইমিং পুলের উল্টো দিক দিয়ে লাল সুরকি বিছান সরু একটা রাস্তা। রাস্তাটা ছোট ছোট ঝাউ গাছের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে একটা বাগানবাড়ির সামনে এসে হাজির হয়েছে। বাগানবাড়িতে ঢোকার জন্য পাশাপাশি বসান দুটো বড় দরজা। তার সামনে দাঁড়িয়ে রাজা বললেন, "সারপ্রাইজ পেতে হলে তোমাদের তিনটে হার্ডল্ পার হতে হবে, এটা হচ্ছে তার প্রথম। এখানে দেখছ দুটো দরজা। এরপরেও অনেক দরজা দেখবে। তাদের মধ্যে কতগুলো হবে ঠিক, কতগুলো ভুল। ঠিক দরজা দিয়ে ঢোকা মানে তোমরা সারপ্রাইজের দিকে এগোচ্ছে, বুঝলে তো ?"

"মহারাজ, ভুল দরজা খুললে কি আমরা সারপ্রাইজ থেকে দূরে চলে যাব ?"

"ঠিক ধরেছ বালিকা ! কিন্তু শুধু একটু নয়, অনেক অনেক দূরে । কারণ প্রত্যেকটা ভুল দরজার পিছনেই বসে থাকবে একজন করে নরসুন্দর, আর তিন তিনজন পালোয়ান । নরসুন্দর মানে জানতো ?"

"জানি, নাপিত ।"

"ঠিক । কিন্তু ওরা কেউ হেঁজিপেঁজি নাপিত নয়, খাস আমার নাপিত । নাপিতদের বলে রেখেছি, যারাই ওঘরে ঢুকবে, তাদের যেন জোর করে ন্যাড়া করে দেওয়া হয় । আর পালোয়ানদের বলা আছে, ন্যাড়া করে দেবার পর মাথায় ঘোলঢেলে উল্টো গাধায় চাপিয়ে রাজ্যের বাইরে বার করে দিয়ে আসতে ।"

রাজার কথা শুনে আমরা সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করলাম । ছোড়দার মুখটাই সবচেয়ে ফ্যাকাসে । ওর আবার খুব বাহারের লম্বা লম্বা চুল, একবছর ধরে কাটেনি । প্রফেসর ফেনী মিন মিন করে বললেন, "মহারাজ এটা কি লঘুপাপে গুরুদণ্ড হচ্ছে না ?"

"মোটেই না ! এরচেয়ে অনেক কম মুর্খামির জন্য আমার ঠাকুর্দা লোকদের কোতল করেছেন ।"

"কিন্তু মহারাজ, কোনটা ভুল, কোনটে ঠিক—সে তো আন্দাজে বলা অসম্ভব !"

"আন্দাজ করতে কে তোমাকে বলেছে ?" রাজা ধমক লাগালেন । তারপর পকেট থেকে মার্কার পেন বার করে প্রথম দরজার উপর খসখস করে লিখলেন, 'এই দরজাটা ঠিক দরজা, অন্যটা হচ্ছে ভুল' । দ্বিতীয় দরজার উপর লিখলেন, 'দুটো দরজার মধ্যে একটা হচ্ছে ঠিক, আরেকটা ভুল ।'

"এবার বুঝেছ ?"

প্রফেসর ফেনী একটু মাথা চুলকে জিজ্ঞেস করলেন, "দুটো দরজার লেখাই কি সত্যি ?"

"একটা শুধু ঠিক । কিন্তু মনে রেখ, আরেকটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভুল ! গুডলাক ।" বলেই রাজা অদৃশ্য হলেন । রাজা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ছোড়দাকে বললাম, "চল, এখান থেকে পালাই । রাজা মনে হচ্ছে একেবারে বদ্ধ উন্মাদ ! শেষে ন্যাড়াফ্যাড়া হয়ে গিয়ে যাতা কাণ্ড হবে !"

ছোড়দা আমার কথায় সায় দিল ; প্রফেসর ফেনীরও তাতে আপত্তি দেখলাম না । কোনদিক থেকে পালান যায় তার প্ল্যান শুরু করছি, এমন সময়

রাজা আবার এসে হাজির। মুখটা তেলো হাঁড়ির মত করে রাজা বললেন, "পালাবার চেষ্টা করলে কিন্তু ভাল হবে না বলছি। অনেক কষ্ট হয়েছে আমার দরজায় লিখতে। খাটনিটা যেন খামাকা না হয়!"

আমাদের মুখ চুন, সব চুপ।

"পালাবার উপায় অবশ্যি নেই, আনাচে কানাচে আমার প্রহরীরা লুকিয়ে রয়েছে। মনে রেখ, মাথায় ঘোল ঢালার থেকেও খারাপ শাস্তি আমার জানা আছে।" রাজা অদৃশ্য হলেন। ইতিমধ্যে আমার কান্না পেয়ে গেছে। কেন গুপ্তধন খোঁজার ইচ্ছে হয়েছিল! আর জীবনে রহস্যের ধারে কাছে যাব না। কোনও ডিটেক্‌টিভ বইও পড়ব না, সিনেমা-টিনেমা সব কিছু ছেড়ে দেব। শুধু ঠাকুর-দেবতার বই পড়ব। এখন ভালয় ভালয় বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচি। প্রফেসর ফেনী আমাকে অভয় দিলেন, "ঘাবড়িও না, বুদ্ধি খাটিয়ে নিশ্চয় একটা সমাধান বার করতে পারব।" কিন্তু রাজার প্রহরীরা তো চারদিকে ছড়িয়ে আছে?"

"আরে না, আমি পালাবার কথা বলছি না। বলছি ঠিক দরজা খুঁজে বার

করার কথা।"

"কিন্তু সেটা সম্ভব যদি রাজা ঠিকমত ক্লু দেন, তাই না?"

"আমি যদ্দুর জানি, রাজা ক্ষ্যাপা হলেও লজিকটা ওঁর খুব পরিষ্কার। সুতরাং উল্টোপাল্টা কিছু লিখবেন না।"

"আপনি বলছেন, 'উল্টোপাল্টা লিখবেন না', কিন্তু আমি তো এখনি দেখতে পাচ্ছি রাজা উল্টোপাল্টা লিখেছেন।"

"কি রকম?"

"আমার তো মনে হচ্ছে, প্রথম আর দ্বিতীয় দরজার দুটো লেখাই সত্যি। অথচ রাজা বলেছেন একটা ঠিক, কিন্তু আরেকটা ভুল।"

ছোড়দা ভুরু কুঁচকে বলল, "বুঝতে পারছি তুই কি বলছিস। তুই বোধহয় ভেবেছিস, প্রথম দরজার লেখাটা সত্যি হতে হলে, দ্বিতীয় দরজার লেখাটাও সত্যি হতে হয়। একদিক থেকে সেটা ঠিক, কিন্তু সেক্ষেত্রে রাজার কথাটা ভুল হয়ে যায়। আমাদের ধরে নিতে হবে যে রাজার কথাটাই ঠিক। সেটা সত্যি হতে হলে, প্রথম দরজার লেখাটা হতে হবে ভুল, আর দ্বিতীয় দরজার ঠিক। দুটো দরজার মধ্যে নিশ্চয় একটা ঠিক দরজা আছে, কিন্তু সেটা প্রথম দরজা নয়। কারণ, তাহলে আবার প্রথম দরজার লেখাটা সত্যি হয়ে যায়। অতএব, দ্বিতীয় দরজাটাই হল ঠিক দরজা।"

প্রফেসর ফেনী বললেন, "ছোড়দা, তোমার ডিডাকশন একেবারে পার্ফেক্ট। চল দরজাটা খুলি।"

ভয়ে ভয়ে আমিই দরজাটা খুললাম। বাব্বাঃ, বাঁচা গেল, নাপিত-ফাপিত কেউ নেই! শুধু ছোট্ট একটা ঘর। তার একপাশ পর্দা দিয়ে ঢাকা, আর অন্যপাশে একটা চেয়ারে রাজা কতগুলো সাইন নিয়ে বসে আছেন। আমাদের দেখে রাজা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "যাক প্রথম পরীক্ষায় সবাই পাশ করেছ। ভালকথা, বুদ্ধিটা কার?"

আমরা ছোড়দাকে দেখালাম।

"বুঝলাম, মাথাটা একেবারে হাওয়া মহল নয়! তবে এবার মাথাটাকে আরেকটু এক্সারসাইজ করাতে হবে।" এই বলে রাজা পর্দাটাকে সরিয়ে ফেললেন। সেখানে দেখি পর পর তিনটে দরজা লাগান। রাজা তাঁর সাইনগুলো থেকে তিনটে বেছে, বোর্ডপিন দিয়ে সেগুলো দরজায় লাগিয়ে দিলেন।
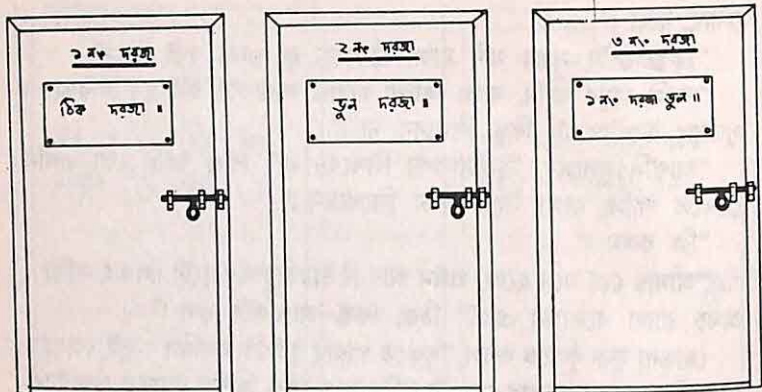
আমি বললাম, "মহারাজ, এই তিনটে সাইনের মধ্যে কোনটা সত্যি ?"

মুখ ভেংচে রাজা বললেন, "ভারি আবদার তো ! সেটা বলে দিলে আর রইল কি ?"

আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিলাম, না-না, আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে তিনটের মধ্যে ক'টা নোটিস সত্যি ।"

রাজা কিছুক্ষণ গম্ভীরমুখে 'হুম্‌ম্‌ম্, হুম্‌ম্‌ম্' শব্দ করলেন, তারপর বললেন, "বড়জোর একটা সত্যি ।"

"তার মানে সবগুলোও মিথ্যে হতে পারে ?"

"তা পারে কিছুই অস্বাভাবিক নয় ।"

প্রফেসর ফেনী দেখি কথাটা শুনে ঘন ঘনকপাল কোঁচকাচ্ছেন । বুঝলাম ভীষণভাবে চিন্তা করছেন । "মহারাজ, আর কি কিছুই আমাদের বলবেন না ?" দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে প্রশ্নটা তিনি করলেন ।

"বলেছি নাকি যে কিছু আর বলব না ?" ধমক দিলেন রাজা, "বলেছি ?"

"তা নয় ।"

"তাহলে বক্‌বক্ করছ কেন ?"

"ভেরি সরি ।"

"থাক থাক, আর সায়েবীকেতা দেখাতে হবে না ।"

ভারি বদ্‌মেজাজী রাজাতো ! অবশ্য গল্পটল্পে যা পড়েছি রাজারা সবাই বোধহয় অল্পবিস্তর এরকমই ! রাজার বকাবকিতে প্রফেসর ফেনী একটু

কাঁচুমাঁচু হয়ে গেলেন। রাজা কিছুক্ষণ হাত পিছনে জড়ো করে চোখ বুজে রইলেন। তারপর চোখ না খুলেই বললেন, "তিনটে দরজার মধ্যে একটা ঠিক বাকি দুটো ভুল। বুঝতে পারছ তো, আমি কিন্তু দরজায় টানান লেখাগুলোর কথা বলছি না, শুধু দরজার কথা বলছি।" রাজা চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কি মনে করে ফিরে এসে বললেন, "আর হ্যাঁ, যে দরজা দিয়ে তোমরা এ ঘরে ঢুকেছ, সেটা ভুল-ঠিক কোনওটাই নয়। তবে সেটা দিয়ে পালাবার মতলব করলেই একেবারে শূলদন্ড। মনে থাকে যেন!"

রাজা চলে যেতেই প্রফেসর ফেনী মুখ খুললেন, "আমার ধারণা এটার উত্তর আমি আঁচ করতে পেরেছি।"

"বলুন, বলুন।"

"রাজারকথা অনুযায়ী তিনটে দরজার মধ্যে একটা হচ্ছে ঠিক। এখন একনম্বর আর তিননম্বর দরজার নোটিস দুটো পরস্পরবিরোধী। অতএব সে দুটো কখনোই একসঙ্গে সত্যি বা মিথ্যে হতে পারে না। তাদের মধ্যে একটাকে সত্যি এবং আরেকটাকে মিথ্যে হতে হবে। এদিকে রাজা বলেছেন

যে তিনটে নোটিসের মধ্যে বড়জোর একটা সত্যি। তার মানে দাঁড়াল দ্বিতীয় নোটিসটা মিথ্যা। এবার বল, দ্বিতীয় নোটিসটা মিথ্যে হওয়ার মানে কি ?

"হুর্‌র্‌রে, দ্বিতীয় দরজাটাই ঠিক।" আমি আর ছোড়দা ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললাম।

"নাঃ, তোমরা দেখছি খুব চটপটে।" রাজা দেখি কোলে একগাদা সাইন নিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন। "আগে জানলে এ ঘরে দুটোর চেয়ে অনেক বেশী দরজা লাগাতাম। ইস্‌ স্‌ স্‌, কি ভুলই না করেছি!" এইসব বলে কিছুক্ষণ আফশোস করার পর, নোটিসের বাণ্ডিল থেকে অনেক খুঁজে পেতে রাজা দুটো নোটিস বার করলেন। নোটিস দুটো দরজায় লাগিয়ে বললেন, "আর পারি না। তোমাদের জ্বালায় শান্তিতে বসার জো আছে! এটাই শেষ হার্ডল্‌ কিন্তু, আর খাটতে পারব না!" ইত্যাদি বলে তাড়াহুড়ো করে তিনি চলে গেলেন। ভাবটা যেন আমরাই ওঁকে 'সাইন লাগাও, ধাঁধা দাও শক্ত শক্ত', এইসব বলে আব্দার করেছি!'
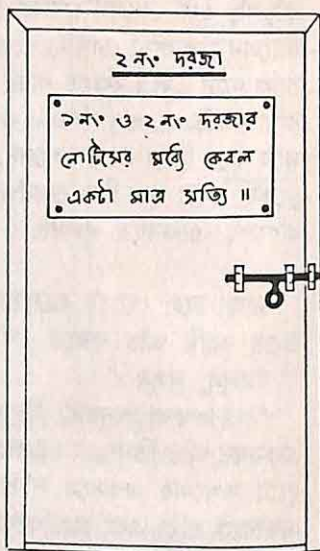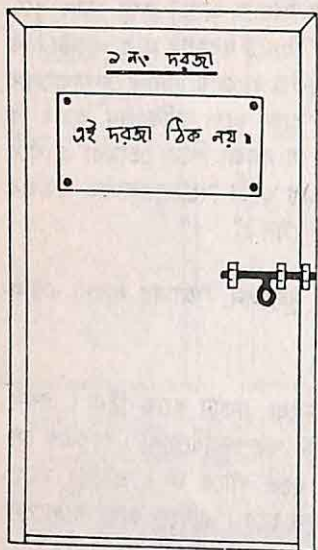
নোটিসদুটো পড়ে মনে হল সমস্যাটা খুব শক্ত নয়। কেউ কিছু বলার আগেই আমি বললাম, "যদি দুনম্বর নোটিস সত্যি হয়, তাহলে এক নম্বরকে মিথ্যে হতে হবে। তার মানে এক নম্বর দরজাটাই ঠিক।"

"কিন্তু দু নম্বর নোটিসটা যদি মিথ্যে হয় ?" ছোড়দা জিজ্ঞেস করল।

"সেক্ষেত্রে দুটো নোটিসই হয় সত্যি, অথবা মিথ্যে।" "ঠিক বলেছিস। কিন্তু দুটোই একসঙ্গে সত্যি হওয়া অসম্ভব। কারণ দু'নম্বর সত্যি হওয়া মানে এক নম্বরকে মিথ্যে হতে হবে।"

"তার মানে দুটো নোটিসই মিথ্যে। এক্ষেত্রেও একনম্বর দরজাই হচ্ছে ঠিক।" নিজের কৃতিত্বে নিজেই আমি অভিভূত !

"তাহলে আর দেরি করা কেন ?" এই বলে ছোড়দা দরজাটা খুলতে যাচ্ছে, এমন সময় প্রফেসর ফেনী চেঁচিয়ে উঠলেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও !"

"কেন, কি হল ?" আমরা দুজনেই প্রশ্ন করলাম।

"হিসেবে ভুল হয়েছে তোমাদের। আরেকটু হলেই সর্বনাশ হয়েছিল আর কি !"

"কোথায় গোলমালটা পেলেন শুনি ?" আমার ঠাসবুনুনী যুক্তিতেও খুঁত ধরতে চাইছেন বলে একটু রাগই লাগল আমার।

"আরেকটু ভাব। এক নম্বর নোটিসটা হয় সত্যি অথবা মিথ্যে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ দরজাটা হয় ঠিক, অথবা ভুল।*কিন্তু দু'নম্বর নোটিসের বেলায় সেটা খাটে না।

"তার মানে ?"

"ওটা সত্যি-মিথ্যে কোনওটাই নয়।"

আমাদের হতভম্ব ভাবটা লক্ষ্য করে প্রফেসর ফেনী বলে চললেন, "আচ্ছা একটু বুঝিয়ে বলি। তর্কের খাতিরে ধরা যাক, দু'নম্বর দরজাটাই ঠিক দরজা।"

"বেশ।"

"এখন ধরাযাক দু'নম্বর দরজার নোটিসটা সত্যি। তাই যদি হয়, তাহলে দু'নম্বর নোটিস অনুসারে এক নম্বর নোটিসটা মিথ্যে হতে হবে। কিন্তু সেটা হওয়া সম্ভব নয়, কারণ আমরা ধরেছি দু'নম্বর দরজাটাই ঠিক দরজা।"

"কিন্তু দু'নম্বর নোটিসটা সত্যি হতে হবে সেটা কে বলেছে ?" আমি প্রশ্ন তুললাম।

"ঠিক কথা কেউই বলেনি। কিন্তু একটু চিন্তা কর। এক নম্বর নোটিসটা নিশ্চয় সত্যি, কারণ আমরা ধরেছি দু'নম্বর দরজাটাই ঠিক দরজা। তুমি বলছ যে দু'নম্বর নোটিসটা মিথ্যা। তার মানে একটা নোটিস সত্যি আর আরেকটা হল মিথ্যে। কিন্তু সেটাইতো দু'নম্বর নোটিসের বক্তব্য। তাহলে সেটা মিথ্যে হয় কি করে ?"

"আরে এটাও তো সেই মণ্ডলপুরের মোড়লের কথাগুলোর মত ! ভীষণ বোকা বনছিলাম তো !" ছোড়দা মনে হল বেশ লজ্জা পেয়েছে। আমিও চুপিচুপি ঘাম মুছলাম। আরেকটু হলেই হয়েছিল আর কি ! বেনীদুটোকে এখানেই বিসর্জন দিতে হত !

"মহারাজ, মহারাজ !" প্রফেসর ফেনী গলা উঁচু করে ডাক দিলেন।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মহারাজ পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে বললেন, "কি ব্যাপার এখনো ঠিক দরজা বের করে উঠতে পারলে না ?"

★ পরে আমি চিন্তা কতে দেখেছি, এ কথাটাও ঠিক নয়। রাজা একবারও বলেননি যে দরজামাত্রই হয় ভুল কিংবা ঠিক হতে হবে

"মহারাজ ধৃষ্টতা মাপ করবেন, কিন্তু আপনার এই নোটিসের কোনও অর্থ হয় না।"

রাজার মুখ দেখে মনে হল, এক্ষুণি প্রফেসর ফেনীকে কোতল করবেন। চোখদুটো লাল করে বললেন, "ভারি বেয়াদপ তো তুমি!"

প্রফেসর ফেনী কিন্তু এবার ঘাবড়ালেন না। আস্তে আস্তে বললেন, "অনুমতি দেনতো আমার যুক্তিগুলো বলতে পারি।"

রাজা কিছুক্ষণ নোটিসদুটোর দিকে তাকিয়ে খপখপ করে সেগুলো খুলে বগলে পুরলেন। তারপর কোনও কথা না বলে প্রথম দরজাটা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রথমে ছোড়দা, তারপর আমি, আর তারপর প্রফেসর ফেণী গুটিগুটি রাজার পিছন পিছন ঢুকলাম।

"ক'টা হার্ডল আমি বলেছিলাম ?" রাজা ব্যাজারমুখে জিজ্ঞেস করলেন।

"তিনটে," আমি একটু ভয়ে ভয়ে বললাম।

"তার মানে সবগুলোইতো তোমরা পার হয়ে গেছ ?"

"হ্যাঁ।"

"এবার তাহলে সারপ্রাইজ চাই ?" তের্ছা চোখে রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

কি উত্তর দেব ভাবছি। হ্যাঁ বলাটা বোধহয় বড্ড হ্যাংলামি হবে! হঠাৎ রাজা প্রফেসর ফেনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওই যাঃ, একুশ বছর বয়স হলে তো বিগ্ সারপ্রাইজ পাবার উপায় নেই। তাহলে কি করা ?" রাজা কিছুক্ষণ গোঁফে তা দিলেন, তারপর বললেন, "ঠিক হ্যায়, তোমার জন্য একটা মিনি সারপ্রাইজের বন্দোবস্ত করতে পারি। তিকস সিং, এঁকে সসম্মানে প্রাসাদে নিয়ে যাও।"

বলামাত্রই একটা এই-তাগড়া লোক এসে সাতবার সেলাম ঠুকে প্রফেসর ফেনীকে নিয়ে চলে গেল। প্রফেসর ফেনী ছোড়দার সঙ্গে কোলাকুলি। আর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে চলে গেলেন। অল্পক্ষণের জন্য ওঁর সঙ্গে আলাপ। কিন্তু এর মধ্যেই এত ভাল লেগে গিয়েছিল যে আমার প্রায় কান্না এসে গেল। ছোড়দাও দেখি বেশ মুভ্ড় হয়ে গেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজেকে সামলাচ্ছে।

প্রফেসর ফেনী চলে যেতেই রাজা আমাদের নিয়ে কোণের একটা দরজার সামনে দাঁড় করালেন। "এই দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে যাও, তাহলেই দেখবে

সারপ্রাইজটা কি। একটা নয় দু'দুটো। বুঝলেতো দু'দুটো !"

দরজা খুলে বেরিয়েই বুঝলাম রাজা কি বলতে চেয়েছেন ! সেই ইঁটের পাঁজার পশ্চিমকোণে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। পেছনে ফিরে দেখি কোথায় সেই দরজা, ইঁটের একটা ফাঁক যেন চোখের সামনে বন্ধ হয়ে গেল ! ছোড়দা চেঁচিয়ে উঠল, "হোয়াট এ সারপ্রাইজ !"

বললাম, "সেটা তো হল এক নম্বর ! কিন্তু দু'নম্বরটা কোথায় ?"

"ঠিক কথা, আয় একটু খুঁজে দেখি।"

খুঁজছিতো খুঁজছি, কিন্তু কোথায় কি ! রাজার কথা কি তাহলে মিথ্যে ? হঠাৎ দেখি ছোড়দা হো হো করে হাসতে শুরু করেছে, থামছেই না।

"ধ্যেৎ, এত হাসছিস কেন ?"

"এখনো বুঝতে পারিসনি ?"

"কি বুঝতে পারিনি ?"

"তুই এতক্ষণ ধরে কি ভাবছিলি ?"

"কি ভাবছিলাম ?"

"ভাবছিলি না যে কি পাবি, কি পাবি ?"

"ভাবছিলামই তো !"

"কিন্তু পেলি কি ?"

"কোথায় পেলাম, কিছুইতো পাইনি।"

"না পেয়ে তুই সারপ্রাইজড হলি না ? আরে মূর্খ, ওটাই হচ্ছে দু'নম্বর।" ছোড়দা মিটি মিটি হাসতে লাগল ॥

॥ শেষ ॥
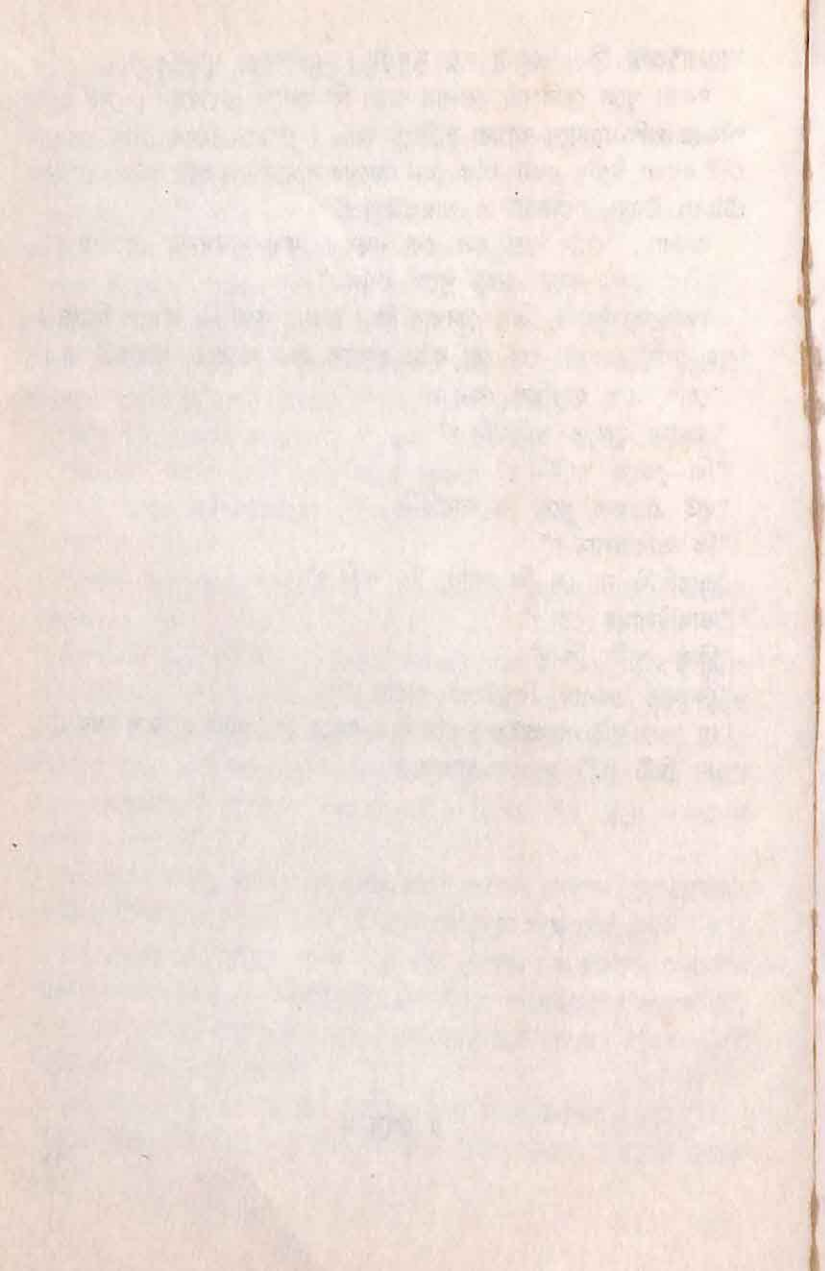
এ-বই শুধুই ধাঁধার বই নয়, এই প্রথম বাংলা সাহিত্যে শুধু ধাঁধার উপর ভিত্তি করে লেখা হল পুরো মাপের একটি উপন্যাস। শুধু যা তফাত তা হল, এক নিঃশ্বাসে শেষ করা যাবে না এই বই। ধাঁধাপুরীর অন্দরমহলে ঢোকার চাবিকাঠি যেমন বুদ্ধি খরচ না করে পাওয়া যাবে না, তেমনই, ধাঁধাপুরীর ভিতরমহলে ঢুকেও পদে-পদে থমকে দাঁড়াতে হবে। অদ্ভুত সব লোকজন অপেক্ষা করে আছে সেখানে কিম্ভূত সব সমস্যা নিয়ে। সেইসব সমস্যার উত্তরও বার করতে হবে দারুণ মাথা খাটিয়ে। প্রশ্নগুলো বিদ্ঘুটে শুনতে হলে কী হবে, উত্তর-গুলোয় পেঁছতে হবে যথার্থ যুক্তি-শৃঙ্খলার সোপান বেয়ে। ভুল পথে এগোলেই দরজা বন্ধ। আর এই বন্ধ দরজা নিয়েও কি কম ধাঁধা?

শুধু ছোটদের জন্য এ-বই লেখা নয়। বড়রাও কাড়াকাড়ি করবেন 'ধাঁধাপুরীর গোলকধাঁধা' নিয়ে।

বুদ্ধির দৌড় আর যুক্তির ধার—দুইয়েরই পরীক্ষা নেবার বই 'ধাঁধাপুরীর গোলকধাঁধা'।

প্রচ্ছদ প্রবীর সেন

ধাঁধাপুরীর
গোলকধাঁধা
সুজন দাশগুপ্ত